বিড়াল দুটিকে ক্ষিতীশ ছোট্ট ধমক দিতেই ওরা বারান্দা থেকে নেমে গেল।

''দারুণ ট্রেনিং তো।''

''ওদের ভালোবাসি তাই কথা শোনে। ভালোবাসলে সবকিছু করিয়ে নেওয়া যায়, মানুষকে দিয়েও।''

''তার মানে মানুষ আর জানোয়ারকে একই লাইনে ফেলছেন।''

''তা কেন। জানোয়ার দেখলে মানুষের গা শিরশির করে, কিন্তু মানুষ দেখলে জানোয়ারের করে কিনা আমি জানি না।''

''অই অই, অমনি ত্যারাব্যাকা কথা শুরু হয়ে গেল।'' বলতে বলতে বিষ্টু ধর পকেট থেকে বক্তৃতা লেখা কাজগ বার করল। ''আমি দাগ দিয়ে রেখেছি জায়গাগুলো। রাস্তায় রবারের বল ফাইনাল, চিফ গেস্ট বিনোদ ভড়। বুঝলেন না, ওর দলের ছেলেরা থাকবে। ফস্ করে যদি কিছু প্রশ্ন করে বসে আর যদি জবাব দিতে না পারি তাহলে আওয়াজ খাব, বেইজ্জত হব।''

ক্ষিতীশ কাগজটা মন দিয়ে পড়ে বলল, ''হুঁ, কী জানতে চান?''

''ওই যে লিখেছেন 'ট্যালেন্ট ঈশ্বরের দান। সেটা ফুটিয়ে তোলা যায় কিন্তু তার বদলি হিসাবে কোনোকিছুই সে জায়গায় বসানো যায় না। যার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, সেটা যদি সে ব্যবহার না করে তাহলে তাকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করতে হবে।' কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে বহু ট্যালেন্টওলা লোক আছে, যারা শুধু খাওয়া-পরার ধান্দাতেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব আগে মানুষের দরকার বেঁচে থাকা, এটা তো মানেন?''

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল।

''রাশিয়া-টাশিয়ার বড়ো বড়ো খেলোয়াড়দের খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হয় না। গভরমেন তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে, স্টেটই তাদের সব কিছু দেয়। সেই রকম আমাদের দেশেও গভরমেনকে দেখা উচিত যাতে প্লেয়াররা খাওয়া-পরার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এসব কথা একটু বলা দরকার, বুঝলেন না, পাবলিক এখন লেফটিস্ট ধরনের তো।''

''কিন্তু ভারত বা বাংলা তো কম্যুনিস্ট দেশ নয়, এখানে গণতন্ত্র। এখানে প্লেয়ারকে সব কিছুরই জন্য লড়তে হবে। গণতন্ত্রে এই স্বাধীনতাটা আছে — লড়াইয়ের স্বাধীনতা।''

''আপনি কী সব কিছুরই, মানে খাওয়া-পরার জন্যও জানোয়ারের মতো কামড়া-কামড়ি করে বাঁচতে চান?''

''মানুষ হিসেবে নিশ্চয় চাই না কিন্তু সুইমিং কোচ হিসেবে, হ্যাঁ চাই। আরামে সব জিনিস পাওয়া যায় না, বুঝলেন আপনার পাবলিককে বলবেন যে, একটা সুইমারকে খেটে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উঠতে হয়। পড়ুন পড়ুন লেখাটা পড়ুন তো।''

ক্ষিতীশ উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি শুরু করল। বিষ্টু ধর ভীরুচোখে ক্ষিতীশের দিকে এবং বিশু-খুশির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পড়তে লাগল — ''বিরাট বিরাট খেলোয়াড়ের গৌরবের ছটায় আলোকিত হয় তার দেশ; যদি প্রশ্ন করি, অস্ট্রেলিয়ার কথা উঠলে সব আগে কাদের নাম আপনার মনে ভেসে উঠবে? নিশ্চয় ডন ব্র্যাডম্যান, ডন ফ্রেজার, কেন রোজওয়ালের নাম। যদি বলি ব্রাজিলের প্রধান মন্ত্রীর নাম কী? পারবেন কেউ বলতে? কিন্তু পেলের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। ইথিওপিয়া ছোট্ট দেশ, গরিব দেশ, অখ্যাত দেশ। কিন্তু বিকিলা যখন দৌড়াল, দেশটা বিখ্যাত হয়ে গেল।''

বিষ্টু ধর দম নেবার জন্য থামল। ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে পড়ে একমনে শুনছিল। বলল, ''কিন্তু শুধু মেডেল ধোয়া জল খেয়ে আপনার কী আমার চলবে না। মেডেল তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একটা দেশ বা জাতির কাছে মেডেলের দাম অনেক, হিরোর দাম অনেক। দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে একজন হিরো, সে সাঁতারুই হোক আর সেনাপতিই হোক, আদর্শ স্থাপন করে। তবু ওদের মধ্যে তফাত আছে, বড়ো সাঁতারু জীবনের ও প্রাণের প্রতীক, সেনাপতি মৃত্যুর ও ধ্বংসের। সাঁতারু অনেক বড়ো সেনাপতির থেকে। যুদ্ধজয়ী সেনাপতি সমীহ পায়, আবার ঘৃণাও পায়। কিন্তু বিরাট সাঁতারু সারা পৃথিবীকে প্রেরণা দেয়।''

''আপনি খালি সাঁতারু সাঁতারু বলছেন কেন, ফুটবলার ক্রিকেটার এদের নাম করুন। বাঙালিরা যা ভালোবাসে মিটিংয়ে তাই তো বলব।''

''যা খুশি বলুন, কিছু যায় আসে না। শুধু বলবেন, যারা আমাদের জন্য প্রাণ নিয়ে আসে, আমরা তাদের অবহেলা করি। ভুলে যাই তাদের খাদ্য দরকার, মাথার উপর ছাদ দরকার, খড়ের চালা যদি হয় তাও। আমরাই বাধ্য করি তাদের উঞ্ছবৃত্তি করতে। আমরাই তাদের শেখাই চালাকি করতে, মিথ্যে বলতে। ... এইসব বলার পর আপনার লাইনের কতাবার্তায় চলে আসবেন। খুব কড়া কড়া কথায় গভর্মেন্টকে এক হাত নেবেন।''

''তাহলে একটু গুছিয়ে লিখে দিন। আমার যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।''

ক্ষিতীশ ভ্রূকুটি করে তাকাল। বিষ্টু ধর তাড়াতাড়ি বলল, ''এজন্য নিশ্চয়ই ফি দেবো।''

''ফি চাই না, একটা চাকরি চাই। যে-কোনো চাকরি, অন্তত শ'দেড়েক টাকার।''

''চাকরি!'' বিষ্টু ধর অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, ''কোথায় পাব?''

''আপনার তো ব্যবসা আছে। আমার এখন নিয়মিত টাকা দরকার। এইভাবে, বক্তৃতা তো সারাজীবন লেখা যাবে না।''

''আচ্ছা আমি দেখব'খন।''

আধঘণ্টার মধ্যেই ক্ষিতীশ লিখে দিল। বিষ্টু ধর চলে যাবার পর রান্না চাপিয়ে দিল। উঠোনের দেয়ালে গাঁথা বড়ো হুকে রবারের দুটো দড়ির প্রান্ত আংটায় বেঁধে আটকাবার কাজে লেগে পড়ল। রবার দুটোর অপর প্রান্তে দুটো হাতল। এই রবার পুলি টেনে ব্যায়াম করবে কোনি। কাজটা শেষ করে সে ছোটো পাশ-বালিশের মতো চটের থোলে সের দশেক বালি দিয়ে ভরতে শুরু করল। ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামের সময় এই ওজন ঘাড়ে নিয়ে কোনিকে ব্যায়াম করতে হবে।

লীলাবতী বাড়িতে ঢুকে ক্ষিতীশের কাজ দেখে অবাক হয়ে বলল, ''এগুলো আবার যে বার করলে ব্যাপার কী?''

''কোনির জন্য।''

''কে কোনি!''

''একটা মেয়ে। ওকে তৈরি করব, মেয়েটার মধ্যে জিনিস আছে। একেবারে আকাঁড়া মাটি, গড়তে পারলে দারুণ সুইমার হবে। তোমাকে এনে দেখাব। ভীষণ গরিব।''

লীলাবতী ঘরে ঢুকে গেল। ক্ষিতীশ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ''ভীষণ গরিব, খেতে পায় না। ভাবছি এখানেই ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করব।''

ঘরের মধ্যে থেকে লীলাবতীর শুকনো কঠিনস্বর ভেসে এল, ''ঘরটা নেওয়াই ঠিক করলাম। ওরা রাজি হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা সেলামিতে, এখন টেনেটুনে চলতে হবে বাজে খরচ একদম বন্ধ।''

ক্ষিতীশ আর কথা বাড়াল না। বিকেলে অ্যাপোলোয় গিয়ে দেখল কোনি আসেনি। পরদিন সকালে কোনি এল আধঘণ্টা দেরিতে। ক্ষিতীশ রেগে তাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কোনি বলল, ''খাবারের বদলে বরং আমাকে রোজ একটা করে টাকা দেবেন।''

ক্ষিতীশের রাগটা মুহূর্তে অবাক হয়ে গেল।

''তার মানে? রোজ একটা করে টাকা দিতে হবে আমাকে তুই সাঁতার শিখবি বলে? এটা কি আমার পিতৃদায়?''

''অত খাটাবেন আর খেতে দেবেন না?''

কোনির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ষিতীশ হেসে ফেলল, কোনিও হাসল। দুজনের মধ্যে নিঃশব্দে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

''তুই একটা আস্ত শয়তান। আমাকে চিনে ফেলেছিস দেখছি। দাঁড়া, তোকে আগে সাঁতারের মজাটা পাইয়ে দি, তারপর দেখব জলে নামিস কি নামিস না। এখন আমি তোকে খাটাচ্ছি, তখন তুই খাটার জন্য পাগল হয়ে উঠবি।''

কোনি কথাগুলো শুনল মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে। ক্ষিতীশ সেটা লক্ষ করে আবার বলল, ''লেকে একমাইল সাঁতারে যে মেয়েটার কাছে হেরেছিস, তার নাম হিয়া মিত্র। নামটা মনে রাখিস।''

কোনির চোখ দুটো সরু হয়ে এল। মুখ ঘুরিয়ে সে কস্ট্যুমের কাঁধের পটি ঠিক করতে লাগল।

''মনে রাখিস, অমিয়া বলেছে তোকে পা ধোয়া জল খাওয়াবে।''

কোনি ঘুরে দাঁড়াল। শীর্ণ দেহটা ঝাঁকিয়ে রুক্ষস্বরে বলল, ''কস্ট্যুম সাত দিনে আমি আদায় করব। কিন্তু লাল রঙের আমি পরব না, আমার রং কালো।''

অমিয়া আর বেলা পঞ্চাশ মিটার কোর্সে কিকিং বোর্ড নিয়ে প্র্যাকটিস করছে। কোনি পাড়ের কাছাকাছি। ক্ষিতীশ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। দু-চোখে শুধু অনুমোদন আর কণ্ঠে বিড়বিড়: 'হারামজাদি কোথাকার, আমাকে নিয়ে এতদিন রসিকতা হচ্ছিল! দাঁড়া, তোর ওষুধ আমি পেয়েছি — হিয়া মিত্তির।'

''ক্ষিতীশ, চলছে কেমন?''

নকুল মুখুজ্জে রেলিংয়ে দু-হাত রেখে শুকনো গলায় বলল, ''তুই কি কিছুই খবর রাখিস না! বি এ এস -এর সিলেকশন কমিটি থেকে আমাকে আউট করে দিয়েছে। এ সবই জুপিটারের ধীরেনের কারসাজি। এদিকে অ্যাপোলোর আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। দু-একটা টাকাওলা লোক জোগাড় করে দিতে পারিস, প্রেসিডেন্ট করে রাখব।''

ক্ষিতীশের হঠাৎ মনে পড়ল বিষ্টু ধরকে। বলল, ''চেষ্টা করব। কিন্তু নকুলদা, বি এ এস এ থেকে আউট হয়েছ বলে দুঃখ পাচ্ছ কেন! একটা ক্লাব ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের থেকে। ক্লাবই সুইমার তৈরি করে, ওরা করে মোড়লি।''

''কিন্তু মোড়লদের দলাদলি ঝগড়া প্রতিপত্তির লোভ সুইমারের জীবন শেষ করে দিতে পারে।'' নকুল মুখুজ্জে হেসে উঠে বলল, ''জেনে রাখ এবার অ্যাপোলোর কেউ বেঙ্গল টিমে আসছে না, শুধু ওই দুটো মেয়ে ছাড়া।'' আঙুল দিয়ে সে অমিয়া আর বেলাকে দেখাল। ''ওরা, জেনে রাখ, সামনের বছরই জুপিটারে ফিরে যাচ্ছে।''

নকুল মুখুজ্জে চলে যাবার পর ক্ষিতীশ আবার কোনির দিকে মন দিল।

''হাঁটু ভেঙে পায়ের পাড়ি ... হাঁটু ভেঙে। বলে দিয়েছি না, পা যখন পিছনে ঠেলবি তখন হাঁটু ভাঙবে, ওঠার সময় সোজা থাকবে।''

এই পর্যন্ত চিৎকার করে বলেই তার মনে হলো, অমিয়া বা বেলা শুনে নিয়ে যদি এইভাবে কিকিং শুরু করে! তারপরই ভাবল, এখন আর ওদের পক্ষে আদ্যিকালের সিজার-কিক্ ছেড়ে এই শক্ত কিকিংয়ে আসা সম্ভব নয়। তা হলেও, শুনে নিয়ে ওরা হরিচরণকে বলে দিতে পারে। হরিটা অন্যদের এইভাবে শেখাবে হয়তো।

হাত নেড়ে ক্ষিতীশ ডাকল কোনিকে। পাড়ের কাছাকাছি আসতেই ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, ''যা বলছিলুম হচ্ছে না কেন? গোড়ালিটা টান্টান্ থাকবে...এই রকম পিছন দিকে টান করে ঠেলে রাখবি। আর কিক্ করার সময় যতটা না নীচের দিকে, তার থেকে পিছন দিকেই পায়ের ধাক্কা বেশি দিতে হবে। এইভাবে শোলান্ডার সাঁতার কেটে চারটে গোল্ড জিতেছে টোকিওয়। ..... আবার কর..... সিক্স বিট, এক চক্কর হাত পাড়ি আর সেইসঙ্গে ছ'টা করে পা মারবি ... করে যা করে যা।''

ট্রেনিং শেষে ফেরার পথে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, ''তোর দাদার খবর কী রে, আসতে বলিস একদিন। দেখে যাক কেমন তুই শিখছিস।''

কোনি জবাব দিল না। ক্ষিতীশ লক্ষ করল ওর মুখটা কেমন যেন করুণ আর গম্ভীর হয়ে উঠল।

''দাদার অসুখ হয়েছে। দু-দিন কাজে যায়নি।''

''তাহলে তো দেখতে যেতে হয়। আচ্ছা পরে একদিন দেখতে যাব। আর শোন আজ বিকেলে তোর ওজনটা নেব। এবার থেকে একসারসাইজ শুরু করতে হবে। খাওয়াও বাড়াতে হবে। ট্রেনিং চার্ট ডায়াট চার্ট আমি তৈরি করেছি। ভিটামিন কী কী লাগবে সেটা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব। হেমোগ্লোবিন লেভেল যদি পারি তো টেস্ট করাব।''

ক্ষিতীশ কথা বলতে বলতে বাজারের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা টাকা কোনির হাতে দিয়ে বাজারের দিকে এগোচ্ছে, কোনি ডাকল —

"ক্ষিদ্দা, আর দুটো টাকা দেবেন? তাহলে দু'দিন আর আমায় দিতে হবে না।"

"টাকা? কীসের জন্য?" ভ্রূ কুঞ্চিত হল ক্ষিতীশের।

"চাল কিনব। দাদা তো কাজে যেতে পারছে না।"

কোনি চুপ করে গিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে রইল।

প্রশ্ন না করে ক্ষিতীশ আরো দুটি টাকা দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝেও গেল, প্রতিদিন ডিম-কলা খাওয়ার জন্য যে টাকা দিয়েছে সেটা কীসে ব্যয় হয়।

ঘণ্টাখানেক পরই ক্ষিতীশ হাজির হলো কোনিদের ঘরের দরজায়। তক্তপোশে ময়লা ছেঁড়া কাঁথার উপর কমল শুয়ে। একদৃষ্টে জানালার বাইরে তাকিয়ে। সব ছোটো ভাইটে আর মা উনুনে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির সামনে বসে। ঘরে আর কেউ নেই। ক্ষিতীশ গলা খাঁকারি দিতে কমল তাকাল, অবাক হলো এবং উঠে বসতে গিয়ে দুর্বলতার জন্য টলে পড়ল।

"আসুন। একটু আগেই কোনি বলছিল আপনি একদিন আসবেন। কী আর দেখবেন আমায়!" কমল চট করে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "দেখার আর কিছু নেই। আমি ফিনিশ হয়েই গেছি।"

ক্ষিতীশ তক্তপোশের ধার ঘেঁষে বসল।

"কী হয়েছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা?"

মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে কমল মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আপনি কিন্তু বেশিক্ষণ বসবেন না। ছোঁয়াচে রোগটা।"

"ওষুধ খাচ্ছ?"

কমল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, "কোনির দ্বারা কিছু হবে কি? ও আমাকে রোজ বলে কী কী শিখল। খুব রোখা মেয়ে। যদি বলে করব, তাহলে করবেই। ওকে দিয়ে যদি করাতে পারেন, ওর একটা ভবিষ্যৎ যদি গড়ে দিতে পারেন —"

"হবে। প্রথম প্রথম একটু চঞ্চল ছটফটে থাকে, মন বসলে আমার মনে হয় ও কিছু একটা পারবে।"

"একটা ভাইকে চায়ের দোকানের কাজে দিয়েছি, পনেরো টাকা মাইনে। কোনিকে একটা সুতোর কারখানায় লাগিয়ে দোব ভাবছি। কথাবার্তা বলেছি, ষাট টাকা দেবে। কিন্তু ওর সাঁতার তাহলে আর হবে না।"

কোনি ঘরে ঢুকল। ক্ষিতীশকে দেখে অবাকই হলো। দাদার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে কমলের মাথায় হাত রাখল।

"আমি চাই না কোনি সাঁতার বন্ধ করুক। আমার নিজের খুব ইচ্ছে হতো বড়ো সাঁতারু হব, অলিম্পিকে যাব। আমার দ্বারা কিছুই হলো না, এখন যদি কোনি পারে। আপনি বলছেন, ওর হবে?"

ক্ষিতীশ গম্ভীর স্বরে বলল, "যদি খাটে, যদি ইচ্ছে থাকে।"

"কী রে, শুনলি তো।" কমল মুখ উঁচু করে তাকাল। "ইচ্ছে থাকলে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। ইন্ডিয়া রেকর্ড ভাঙতে হবে তোকে। তারপর এশিয়ান, তারপর অলিম্পিক। পারবি না?"

কমলের স্বর অদ্ভুত করুণ একটা আবেদনের মতো শোনাল। কোনির মুখে ধীরে ধীরে অস্বস্তি, তারপর চাপা ভয় ফুটে উঠল। ঘরের মধ্যে তখন কেউ কথা বলছে না। হাঁড়িতে ভাত ফোটার শব্দটা শুধু সেই মুহূর্তে একমাত্র জীবন্ত ব্যাপার।

কমল আবার বলল, "পারবি না?"

কোনি আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল।

ক্ষিতীশ সারা সকাল অ্যাপোলোয় অপেক্ষা করেছে, কোনি আজও আসেনি। গত দু-সপ্তাহে একবেলাও সে কামাই করেনি। ক্ষিতীশ ভয়ে রয়েছে, এই বুঝি কস্ট্যুম দাবি করে বসে। এখনো সে সমানে বলে যাচ্ছে, ‘‘হয়নি হয়নি, ইঞ্চিখানেকের বেশি জল থেকে হাত উঠবে না। .... অতটা পাশের দিকে হাত যাচ্ছে কেন — ওকি, দুটো হাত ঠিকমতো সমানে চলছে না কেন?’’

বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ মাথা নাড়ে। আর ভাবে কস্ট্যুম আজই কিনতে হবে দেখছি। কখনো কখনো সে জলে নেমে সাঁতার কেটে স্ট্রোক দেখিয়ে দেয়। ওদের পাশ দিয়েই অন্যরা সাঁতার কেটে যায়, বেলা গড়িয়ে যায়, কমলদিঘির জল জনশূন্য হয়ে আসে। কোনি যখন বিরক্ত হয় ওঠে, ক্ষিতীশ বলে, ‘‘দাদার কাছে তো খুব ঘাড় নেড়েছিলিস! ভিকট্রি স্ট্যান্ডে ওঠা খুব সহজ ব্যাপার ভেবেছিস! রেকর্ড করাটা গঙ্গায় আম কুড়োনো নয়, বুঝলি?’’ ফেরার পথে গল্প করেছে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সাঁতারুর, তাদের আন্তরিকতার, নিষ্ঠার, পরিশ্রমের।

অপেক্ষা করে অবশেষে ক্ষিতীশ বেরিয়ে পড়ল অ্যাপোলো থেকে। বিষ্টু ধরের বাড়ি পৌঁছাল মিনিট দশেকের মধ্যে। তাকে দেখেই বিষ্টু ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘‘এই একটু আগে দর্জিপাড়া বয়েজ লাইব্রেরির লোকেরা এসেছিল ওদের অ্যানুয়াল সোশ্যালে চিফ গেস্ট করার জন্য। প্রেসিডেন্ট হবে কে জানেন? ঐ বিনোদ ভড়। আমি রাজি হয়ে গেছি। ওখানে দারুণ একটা ইস্পিচে ওকে ডাউন দিতে হবে। বুঝলেন, ক্ল্যাপ ওকে পেতে দোব না।’’

বিষ্টু ধরের উত্তেজিত মুখ দেখে ক্ষিতীশ চটপট মতলব ভেঁজে নিয়ে বলল ‘‘শুধু একটা বক্তৃতায় ডাউন দিয়ে কী লাভ হবে। লোকে কিছুদিন মনে রেখে তো ভুলে যাবে। তার থেকে এমন একটা কিছু দরকার, যাতে বিনোদ ভড় রেগুলার ডাউন খায়।’’

‘‘কী রকম?’’ বিষ্টু কৌতূহল দেখাল। ‘‘রেগুলার ডাউন কীভাবে সম্ভব!’’

‘‘ভাবতে হয়েছে, তিনদিন ধরে ভেবেছি।’’ ক্ষিতীশ নিজেকে গুরুত্ব দেবার জন্য গলার স্বর ভারিক্কি করে তুলল। ‘‘ভেবে দেখলুম বিনোদ ভড় যে যে অর্গানাইজেশনে আছে, তার পাল্টাগুলোয় ঢুকতে হবে। ও যদি ড্রামা ক্লাবে থাকে, আপনাকেও ড্রামা ক্লাবে ঢুকতে হবে। ও যদি কোনো হরিসভার পৃষ্ঠপোষক হয়, আপনাকেও একটি হরিসভায় ঘাঁটি করতে হবে। ও যদি কোনো সুইমিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয় .....’’

‘‘আছে!’’ বিষ্টু ধর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘জুপিটারের প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড়।’’

ক্ষিতীশ মাথা হেলিয়ে বলল, ‘‘আপনাকে জুপিটারের রাইভাল ক্লাবে ঢুকতে হবে।’’

‘‘সেটা তো অ্যাপোলো। কিন্তু ঢুকব কী করে?’’ বিষ্টু ধর বিমর্ষ গলায় বলল। ‘‘পারেন একটা কিছু করে দিতে?’’

‘‘চেষ্টা করতে হবে। আজও আমি নকুল মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলেছি। সাত হাজারের কমে রাজি হচ্ছে না।’’

‘‘সাত হাজার! মানে?’’

‘‘মানে, প্রেসিডেন্ট হতে গেলে ডোনেশন তো দিতে হবে। অমনি অমনি কি আর হওয়া যায়। বিনোদ ভড়ও তলায় তলায় চেষ্টা করছে ওর দাদাকে অ্যাপোলোয় ঢোকাবার জন্য। পাঁচ হাজার পর্যন্ত অফার করেছে।’’

‘‘কিন্তু সাত হাজার! কমসম করা যায় না?’’

‘‘কত কমাবেন? পাঁচ হাজার অফার তো পেয়েই গেছে। বিনোদ ভড় এম এল এ, মন্ত্রী হবারও চান্স খুব, ওকে তো সবাই হাতে রাখতে চাইবে। আপনি যদি বেশি টাকা না দেন তাহলে ওদের লাভটা কী হবে বলুন?’’

‘‘তা তো বটেই।’’ বিষ্টু ধর চিন্তিত হয়ে পেটে হাত বুলোতে লাগল।

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ করে আবার বলল, ‘‘দেরি করলে চলবে না। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলতে হবে। বিনোদের পার্টি উঠে-পড়ে লেগেছে।’’

‘‘বেশ সাত হাজারই দোব। কিন্তু ....’’

বিষ্টু ধরের কথা শেষ হবার আগেই চাকর ঘরে ঢুকে জানাল, একজন মাইজি দেখা করতে এসেছে।

এরপর ক্ষিতীশকে অবাক করে ঘরে ঢুকল লীলাবতী। ক্ষিতীশকে এখানে দেখে সেও অবাক। তবে কোনো কথা বলল না।

‘‘টাকাটা এনেছি।’’ লীলাবতী তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে বিষ্টু ধরকে বলল।

ব্যস্ত হয়ে বিষ্টু বলল, ‘‘পাশের ঘরে আসুন, আপনার রসিদ-টসিদ সব রেডি করা আছে।’’

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরই বিষ্টু একা ঘরে ফিরে এল। ক্ষিতীশ তখন কৌতূহলে ফেটে পড়ার মতো অবস্থায়।

‘‘কী ব্যাপার, কীসের টাকা?’’

‘‘ওই একটা ঘর ভাড়া নেওয়ার ব্যাপার। হাতিবাগানে আমার একটা বাড়িতে এরা দোকান করবে টেলারিং শপ। তাই কিছু টাকা দিয়ে গেল।’’

‘‘পাঁচ হাজার টাকা!’’

বিষ্টু ধর চমকে উঠল। ‘‘কী করে জানলেন!’’

‘‘টাকাটা যার কাছ থেকে নিলেন, সে আমার স্ত্রী। ওর কাছ থেকে সেলামি নেওয়া মানে আমার কাছ থেকেই নেওয়া।’’

বিষ্টু ধর ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ক্ষিতীশের গম্ভীর মুখ দেখে। তোতলা স্বরে বলল, ‘‘আমি তো তা জানতাম না।’’

‘‘আমিও জানতাম না আপনিই বাড়িওলা। যাই হোক, এবার আমরা দুজনেই জানলাম। জানার পর, আপনি কি টাকাটা এখন নেবেন?’’

বিষ্টু আরো তোতলা হয়ে গেল। ‘‘ইয়ে এটা তো ব্যবসার ব্যাপার.. আমাকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।’’

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল। ‘‘চলি। বিনোদ ভড় কোর্টে বেরিয়ে গেছে। তা রাত্তিরেই দেখা করব ওর সঙ্গে।’’

‘‘না না, প্লিজ যাবেন না।’’

‘‘হাজার দুয়েক টাকা ডোনেশন আর একটা নাইলনের কি বেলনের কস্ট্যুম কেনার জন্য একশো টাকা যদি দিতে পারেন তা হলে গ্যারান্টি দিচ্ছি অ্যাপোলোর প্রেসিডেন্ট করে দেবোই। তবে এই সেলামির টাকাটা ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া বক্তৃতাও আমি আর লিখে দিতে পারব না।’’

বিষ্টু ধর চূর্ণ বিচূর্ণ। কথা বলার আর ক্ষমতা নেই। দুটি চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। শুধু মাথাটি নেড়ে বলল, ‘‘গাছে অনেক দূর উঠে গেছি। মই কেড়ে নিলে নামতে পারব না।’’

বিষ্টু ধর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একশো টাকার নোটের বান্ডিল নিয়ে ফিরে, সেটা ক্ষিতীশের হাতে দিয়ে বলল, ‘‘উনি আপনার স্ত্রী হন তো?’’

‘‘আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!’’

বিষ্টু জিভ কেটে কান মুলল। ক্ষিতীশ আর অপেক্ষা করল না। বেরিয়ে আসছে, তখন শুনল বিষ্টু কাতর কণ্ঠে বলছে, ‘‘আমার বক্তৃতাটার কী হবে!’’

''দেবো দেবো, লিখে দেবো।''

বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশ নোটের বান্ডিলটা নিজের বাক্সে রেখে দিয়ে ভাবতে শুরু করল, এবার কী করবে! টাকাগুলো লীলাবতীকে ফেরত দিতেই হবে, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু আদায়ও করে নিতে হবে। এবং তা করতে হবে কোনিরই জন্য।

লীলাবতী বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, ''ওখানে তুমি কী করছিলে?''

''মাঝে মাঝে যাই বুদ্ধি পরামর্শ দিতে। তুমি কেন গেছিলে?''

''ওর কাছ থেকেই তো ঘর নিয়েছি। সেলামির টাকাটা দিতে গেছলুম।''

ক্ষিতীশ হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে বলল, ''আগে যদি আমায় বলতে তাহলে টাকাটা দিতে হতো না। আমি বারণ করলে বিষ্টু ধরের সাধ্যি নেই টাকা নেবার, তবে বললে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবে।''

''দ্যাখো না একবার বলে, অনেকগুলো টাকা। দেবার সময় গা করকর করছিল।'' লীলাবতী ব্যগ্র হয়ে বলল।

''কিন্তু কোনিকে যে ওর বাড়িতেই খাওয়ার ব্যবস্থা করব ভাবছিলাম। এরপর কি অতগুলো টাকা ফেরত দেবার কথা বলা যায়! মেয়েটাকে যে খাটাব, তার জন্য কিছু তো করতে হবে! দাও গামছাটা, চান করে আসি।''

বিকেলে লীলাবতী অন্য মূর্তি ধরে বলল, ''পরের মেয়ের জন্য তো খুব মাথা-ব্যথা। আর আমি যে এত কষ্ট করে দোকানটা দাঁড় করালাম, তিল-তিল করে টাকা জমিয়ে ব্যবসাটা বড়ো করার চেষ্টা করছি, তাতে একটু সাহায্যও কি করবে না!''

ক্ষিতীশ বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বলে গেল, ''আচ্ছা দেখছি।''

অ্যাপোলোয় সারা বিকেল অপেক্ষা করল ক্ষিতীশ, কোনি এল না। নকুল মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা হলো।

''প্রেসিডেন্ট পেয়েছি, কত টাকা ডোনেশন চাও নকুলদা?''

নকুল একটু হকচকিয়ে বলল, ''কত টাকা মানে? এখন বটুবাবু পাঁচশো দিচ্ছে, তাও টিপে টিপে দেয়।''

''ঠিক আছে। আমি দু'হাজারি ধরেছি।''

ক্ষিতীশ তারিয়ে তারিয়ে নকুল মুখুজ্জের অবস্থাটা লক্ষ করার পর বিষ্টু ধর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে বলল, ''কিছু ভেব না তুমি, টাকা এসে যাবে। তবে আমার ওই মেয়েটার পুরো ট্রেনিং ফেসিলিটি দিতে হবে কিন্তু।''

নকুল মুখুজ্জে একগাল হেসে মাথাটা হেলিয়ে বলল, ''নিশ্চয়।''

অ্যাপোলো থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ ভাবল, মেয়েটা কেন আজ এল না, একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। বড্ড ফাঁকিবাজ। কিছুর একটা লোভ না দেখালে খাটতেই চায় না। তবে একটা দুর্বলতা আছে, সেটা ওর অপমানবোধ। ক্ষিতীশের প্রায়ই মনে পড়ে, প্রাইজ না নিয়ে লেক থেকে কোনির চলে আসা আর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার বিজয়ীর নামটি শোনার সেই ভঙ্গিটি। দাদার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে থাকা মেয়েটি হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল।

বস্তির মধ্যে আলো নেই। ক্ষিতীশ একটু অসুবিধায় পড়ল ঘরটা খুঁজে বার করতে। অবশেষে একটা বাচ্চা ছেলে তাকে দেখিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে কুপি জ্বলছে। কোনির ছোটো ভাই দুটো মেঝেয় ঘুমিয়ে। তক্তপোশে সম্ভবত ওর মা শুয়ে। ক্ষিতীশ ডাকল, ''কোনি।''

ঘর থেকে নিঃশব্দে কোনি বেরিয়ে এল।

''ব্যাপার কী তোর! আজ যাসনি কেন? এভাবে কামাই দিলে আর তাহলে যেতে হবে না। তোর দাদাকে আমি জানিয়ে দেবো, হবে-টবে না কিছু তোর দ্বারা।'' বিরক্তস্বরে ক্ষিতীশ বেশ জোরেই কথাগুলো বলল।

কোনি কথা না বলে একইভাবে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ক্ষিতীশের পিছন থেকে খনখনে স্বরে কে বলে উঠল, ‘‘কেমন লোক গা তুমি, কাল রাতে মেয়েটার দাদা মরে গেল আর তুমি এখন তাকে ধমকাতে নেগেছ?’’

ক্ষিতীশ প্রথমে বুঝতে পারেনি সে কী শুনল। পিছনে তাকিয়ে বলল, ‘‘কে মরে গেছে?’’

‘‘জানো না দেখছি! কাল বিকেল থেকে মুখে অক্ত উঠল, ভলকে ভলকে, রাত্তিরেই কাবার। কোনির দাদা গো!’’

ক্ষিতীশ বার দুয়েক কেঁপে উঠল এবং শুনল কোনি খুব ক্লান্ত এবং শান্ত স্বরে বলছে, ‘‘ক্ষিদ্দা, এবার আমরা কী খাব?’’

রাগে চিৎকার করে উঠল ক্ষিতীশ, ‘‘পারতেই হবে, পারতেই হবে। কোনো কথা শুনব না।’’

পায়ের কাছে পড়ে থাকা ঢিলটা তুলে সে কোনির দিকে ছুঁড়ে মারল।

‘‘পায়ে পড়ি ক্ষিদ্দা, আর আমি পারছি না।’’

‘‘মাথা ফাটিয়ে দোব তোর.. মরে যা তুই, মরে যা, মরে যা।’’ ক্ষিতীশ ঢিল খুঁজে পেল না। এধার ওধার তাকিয়ে মালির ঘরের গায়ে দাঁড় করানো সরু বাঁশের লগাটাকে দেখতে পেল।

‘‘ক্ষিদ্দা, আমি আর পারব না।’’

ক্ষিতীশ রেলিং টপকে ছুটে গিয়ে লগাটা আনল। কোনি পাড়ের কাছে এগিয়ে এসেছে। ক্ষিতীশ দু’হাতে লগাটা তুলে জলে আঘাত করল। কোনির মুখের হাত তিনেক সামনে সেটা পড়ল। আবার সে লগাটা দু’হাত উঁচু করে জলে আঘাত করল।

‘‘মাথা ভেঙে দেবো। জল থেকে উঠবি তো মরে যাবি। এখনো দুশো মিটার বাকি।’’

কোনি জল থেকে ওঠার জন্য পশ্চিমের স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মের পিছন দিকে এগোতেই ক্ষিতীশ লগা তুলে পাড় ধরে ছুটল। কোনি থমকে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের কিনার ধরে উঁকি দিতে লাগল। ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্মে উঠতে পারছে না, কেননা পাড় থেকে সেটা অন্তত বারো হাত দূরে এবং মাঝে কোনো সেতু নেই।

‘‘ক্ষিদ্দা ক্ষিদ্দা, আমায় এবেলা ছেড়ে দাও। ওবেলা আমি পুষিয়ে দোব।’’ কোনি ফোঁপাচ্ছে।

‘‘কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমার রুটিন অনুযায়ী কাজ চাই। যতক্ষণ না কাজ পাচ্ছি আজ তোকে উঠতে দোব না।’’

প্ল্যাটফর্ম ধরা দু-হাতের মধ্যে মুখটা গুঁজে কোনি কাঁদছে। ক্ষিতীশ পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে। সকাল ন’টা বেজে গেছে। কমলদিঘির জলে আর কেউ নেই এখন। বেঞ্চগুলোয় অনেকেই বসে, কমলদিঘির ভিতরের পথ দিয়ে পথিকের আনাগোনা। তাদের অনেকে কৌতূহলে তাকাচ্ছে ক্ষিতীশের দিকে। কেউ কেউ দাঁড়িয়েও পড়ছে।

কোনি সাঁতরাচ্ছে। পশ্চিম থেকে পুবের প্ল্যাটফর্মের দিকে। ক্ষিতীশও লগা হাতে পাড় ধরে পুবদিকে হাঁটছে। বিশ্বাস নেই, ওপারে পৌঁছেই কোনি জল থেকে উঠে পড়তে পারে।

ওর ক্লান্ত হাত দুটো যেন কেউ জল থেকে টেনে তুলে আবার নামিয়ে রাখছে। মুখ ফিরিয়ে হাঁ করে বাতাস গিলছে। তখন চোখ দুটো দেখাচ্ছে যেন ঘুমে আচ্ছন্ন। গলায় ঝোলান স্টপওয়াচটা মুঠোয় ধরে ক্ষিতীশ বিড়বিড় করে আপন মনে বকে যাচ্ছে:

জানি রে জানি কষ্ট হচ্ছে, হাত-পা খুলে খুলে আসছে, কলজে ফেটে যাচ্ছে। যাক যাক, তুই যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যা। তুই জানিস ক্ষিদে যখন থাবা মারে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তখন কেমন লাগে। তুই পারবি বুঝতে যন্ত্রণা কী জিনিস। ফাইট কোনি ফাইট —

...মার খেয়ে ইস্পাত হয়ে উঠতে হবে। যন্ত্রণাকে বোঝ, ওটাকে কাজে লাগাতে শেখ, ওটাকে হারিয়ে দে। ...কাম অন কোনি, জোর লাগা, আরো জোরে —

...ট্রেনিং করে করে নিজেকে বাড়াতে হবে কোনি। যন্ত্রণাকে তুই বল, 'দেখে নেব আমাকে কাঁদাতে পারিস কিনা, আমাকে ভয় দেখাতে পারিস কিনা', বলে যা কোনি, 'ক্ষিদ্দা তোমাকে খুন করব। তুমি শয়তান, ছিঁড়ে খাব তোমাকে।' কমলদিঘিকে টগবগ করে ফুটিয়ে তোল তোর রাগে।

..... মানুষের ক্ষমতার সীমা নেই রে, ওরা পাগলা বলছে, বলুক। মূর্খ, মূর্খের দল সব। ঘণ্টাখানেক আরামে হাত-পা ছুঁড়িয়ে ওরা চ্যাম্পিয়ন বানাবার স্বপ্ন দেখে। .... ট্রেনিং ট্রেনিং —

— আরো পঞ্চাশ মিটার এখনো যেতে হবে, শরীরটাকে যন্ত্রণায় ঘষে ঘষে শানিয়ে তোল। দেখবি কী অবাক তোকে করে দেবে ওই শরীর, যা অসম্ভব ভাবছিস তাকে সম্ভব করে দেবে। সোনার মেডেল-ফেডেল কিছু নয় রে, ওগুলো এক একটি চাকতি মাত্র। ওগুলোর মধ্যে যে কথাগুলো ঢুকে আছে সেটাই আসল — মানুষ পারে, সব পারে।

কোনি সাঁতার শেষ করে দু-হাতে প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁপাচ্ছে মাথা নীচু করে। একবার সে মাথা ঘুরিয়ে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। দু-চোখে ঘৃণা আর আক্রোশ। ক্ষিতীশ সেটা লক্ষ করল। লগাটা যথাস্থানে রেখে সে ক্লাবে ঢুকে একটা মোটা খাতা খুলে বসল। এটা কোনির লগ-বুক। প্রতি বেলার ট্রেনিং-এ কাজের ও সময়ের হিসাব ছাড়াও খাওয়ার, ওজনের, নাড়ির স্পন্দনের, রক্তের হেমোগ্লোবিন স্তর পরীক্ষার, আয়রন ও ভিটামিন ট্যাবলেটের তালিকাও এতে লেখা আছে।

লগ-বুকে লিখতে লিখতে ক্ষিতীশ দেখল কোনি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ক্লাব থেকে। প্রতিদিন বেরোবার আগে একবার 'যাচ্ছি' বলে যায়। আজ বলল না। ক্লাব থেকে কোনি যায় ক্ষিতীশের বাড়ি। সেখানেই ওর খাওয়া। ঠিক দশটায় তাকে 'প্রজাপতি'-র রোলার শাটারের তালা খুলতে হয়। দোকান ঝাঁট দিয়ে, কাউন্টার মুছে, কুঁজোয় জল তুলে, তাকে ফাইফরমাশ খাটতে হয়। দুপুরে আবার আসে ভাত খেতে। তখন ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে পনেরো মিনিট ব্যায়াম করে অ্যাপোলোয় যেতে হয়। সাঁতার থেকে আবার প্রজাপতিতে। দোকান বন্ধ করে সে লীলাবতীর সঙ্গে ফেরে। রাত্রে খেয়ে ফিরে যায় বস্তিতে মা ও ভাইদের কাছে। কোনি মাইনে পায় চল্লিশ টাকা।

আজ কোনির দেরি হয়ে গেছে। ক্ষিতীশের বাড়ি না গিয়ে, সে প্রায়ে ছুটতে ছুটতে প্রজাপতিতে এল। লীলাবতী নিজেই দোকান খুলেছে। পাশের ফোটোগ্রাফি দোকানের ছেলেটি ভারী শাটারটা তুলে দিয়ে গেছে। লীলাবতী ওকে দেখেই রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল, ''বেরিয়ে যাও। তোমায় আর দরকার নেই।''

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কোনির মুখ। মুখ নামিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। এই সময় খদ্দের আসায় লীলাবতী আর কিছু বলল না। কোনি একে একে তার কাজগুলো করে গেল। ক্লান্তিতে এবং খিদেয় তখন সে ঝাপসা দেখছে, পা টলছে। তার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করছে কিন্তু দোকানে বসার মতো জায়গাও তার জন্য নেই। একবার সে ভয়ে ভয়ে লীলাবতীকে বলল, ''বউদি, একটু বাড়ি যাব?''

বিরাট একটা মোটা খাতার উপর ঝুঁকে ফ্রকের মাপ লিখতে লিখতে লীলাবতী কড়া স্বরে বলল, ''না''।

কোনি সরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। কাজটা থেকে বরখাস্ত হলে চল্লিশটা টাকা থেকে তাদের সংসার বঞ্চিত হবে।

ওদিকে ক্ষিতীশ বড়ো একটা থলি হাতে অ্যাপোলো থেকে বেরিয়ে তখন একটার পর একটা দর্জির দোকান ঘুরছে কাপড়ের ছাঁট কেনার জন্য। তিনটে লন্ড্রির সঙ্গে তার বন্দোবস্ত হয়েছে। মার্কা দেওয়া নম্বর টুকরো কাপড়ে লিখে জামাকাপড়ে বেঁধে কাঁচতে পাঠাবার জন্য লন্ড্রিগুলোর দরকার হয় এই ছাঁট। ছাঁট থেকে সমান মাপে কাপড় টুকরো করে কেটে ক্ষিতীশকে বিক্রি করতে হয়। ওরা দৈনিক প্রায় তিন কিলো কেনে। ক্ষিতীশ টাকা ছয়-সাত লাভ করে।

দুপুর প্রায় একটা নাগাদ ক্ষিতীশ ছাঁট ভর্তি থলি নিয়ে কোনিদের ঘরের দরজায় হাজির হলো। কোনির মা বেরিয়ে আসতেই

সে ঝাঁজিয়ে উঠল, ‘‘কাল রাতে কোনি কখন ঘুমিয়েছিল?’’

‘‘কেন, রোজ যেমন সময়ে ঘুমোয়।’’ জড়োসড়ো হয়ে কোনির মা বলল।

‘‘ঠিক বলছ?’’ ক্ষিতীশ তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। ‘‘আজ এতো তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ল কেন তাহলে? দ্যাখো মেয়ে, আমার কাছে কিছু লুকোলে কিন্তু ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ঠিক করে বলো, কখন কোনি ঘুমিয়েছে?’’

‘‘না বাবা, আপনার কাছে মিছে বলব না। কাল রাতে কোনি যাত্রা শুনতে গেছল। রাত একটা নাগাদ ফিরে শুয়েছে।’’

‘‘হুঁ।’’ থলিটা এগিয়ে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, ‘‘এগুলো কেটে রেখো আজই, কাল সকালে কোনির হাত দিয়ে ক্লাবে পাঠিও।’’

পাঁচ টাকা কোনির মার হাতে দিয়ে, ফেরার আগে ক্ষিতীশ বিষণ্ণ স্বরে বলল, ‘‘ছোটো মেয়ে, ওর তো সখ হবেই। কিন্তু ওর ভালোর জন্যই তোমাকে কড়া হতে হবে। যেকোনো খেলা সাধনার জিনিস। সিদ্ধিলাভ করতে হলে সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করতে হবে। বহু ছোটোখাটো ব্যাপার আছে সাধনার পক্ষে যা ক্ষতিকর। যাত্রা নিশ্চয় দেখবে, কিন্তু এখন এই ট্রেনিংয়ের সময় বিশ্রাম নষ্ট করে নয়। এগুলো তোমায় বুঝতে হবে।’’

বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশ দেখল লীলাবতী অপেক্ষা করছে। তখুনি সে খেতে বসে গেল। খেতে খেতে খুবই সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘কোনি খেয়েছে?’’

লীলাবতী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ‘‘ওকে দিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না, ঝিমোয় শুধু। বসতে দিই না, দাঁড়িয়েই আজ ঘুমোচ্ছিল।’’

"আজ ওকে খুব খাটিয়েছি।"

"তাতে আমার কী লাভ। পাঁচ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে অন্যদিক থেকে সেটা নিয়ে নিচ্ছ।"

"ওর খাওয়ার জন্য তো মাসে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি।"

"রোজ দুধ ডিম মধু, মাসে পঞ্চাশ টাকায় কি হয়!"

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। ঘরে এসে দেখে কোনি মেঝেয় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বালিশের বদলে দুটি হাত জড়ো করে মাথার নীচে রাখা। ক্ষিতীশ ওর পাশে বসে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরেই কোনি নড়ে উঠে আরো গুটিশুটি হয়ে সরে এল ক্ষিতীশের দিকে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। ক্ষিতীশ ঝুঁকে পড়ল শোনার জন্য।

"দাদা?"

"হ্যাঁ।"

একটা পাতলা হাসি কোনির মুখে চারিয়ে গেল। "আমায় কুমির দেখাবে বলেছিলে।"

"দেখাব, চিড়িয়াখানায় তোকে নিয়ে যাব।" ফিসফিস করে ক্ষিতীশ বলল। "আরো অনেক জায়গায় আমরা যাব — বেলুড় মঠ, ব্যান্ডেল চার্চ, ডায়মন্ড হারবার, জাদুঘর, অনেক অনেক জায়গায়। তারপর তুই যাবি দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজ; তারপর যাবি আরো দূরে টোকিও, লন্ডন, বার্লিন, মস্কো, নিউইয়র্ক।"

ঘুমের মধ্যেই কোনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ক্ষিদ্দা আমাকে কষ্ট দেয় দাদা। আমি ঠিক মেডেল এনে দোব তোমায়।"

কোনি মুখে হাসি নিয়ে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল। ক্ষিতীশ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "তোকে আরো কষ্ট দেবো রে, আরো দেবো।"

রবিবার প্রজাপতি বন্ধ থাকে। সেদিন কোনির ট্রেনিংয়েও ছুটি। ক্ষিতীশের কাঁধে ঝুলছে থলি। তাতে আছে, কাগজের মোড়কে রুটি, আলু ছেঁচকি, গুড়, সিদ্ধডিম আর কলা।

ওরা দুজন বাড়ি থেকে দশটায় বেরিয়েছে। চিড়িয়াখানায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে পুকুরধারে ঘাসে বসেছে। ক্ষিতীশ খাবারের মোড়ক দুটো বার করে বলল, "জল খাওয়াটাই মুশকিল হবে। ওয়াটার বটলটা আনলে হতো।"

ওদের থেকে কিছু দূরে স্কুল ইউনিফর্ম পরা জনা তিরিশ মেয়ে হইচই করে হাজির হলো। সঙ্গে চারজন টিচার। দুজন দারোয়ান খাবারের ঝুড়ি বয়ে আনল। ওরা গোল হয়ে খেতে

বসেছে। কোনি কৌতূহলভরে মাঝে মাঝে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। আর রুটি চিবোচ্ছে।

''ক্ষিদ্দা, ওদের কাছে জল আছে। চাইব?''

''কী করে বুঝলি?''

''ওই তো বড়ো ড্রামটা থেকে জল দিচ্ছে।''

''দ্যাখ তাহলে।''

কোনি এগিয়ে গেল ড্রামের কাছে দাঁড়ানো টিচারের দিকে। ক্ষিতীশ দেখল, কোনি তাকে কিছু বলতেই তিনি কোনিকে আপাদমস্তক দেখে মুখ ফিরিয়ে কী একটা জবাব দিলেন। তাইতে কোনি অপ্রতিভ হয়ে ফিরে এল।

''দিল না তো।''

কোনির মুখটা থমথমে। শুধু বলল, ''বড়োলোকদের মেয়েদের স্কুল।''

''তাই দিল না বুঝি!'' ক্ষিতীশ কৌতুকের সুরে বলল।

''বড়োলোকরা গরিবদের ঘেন্না করে।''

ক্ষিতীশ এবার একটু অবাক হলো। এইসব ধারণা এইটুকু কোনির মাথায় ঢুকল কী করে!

''তোকে কে বলল, বড়োলোকরা গরিবদের ঘেন্না করে?''

''আমি জানি। দাদা আমায় বলেছিল, টাকা থাকলেই সবাই খাতির করে।''

''চল, জল খেয়ে আসি কল থেকে।''

ওরা দু-চার পা এগিয়েছে, তখনই একটি মেয়ে ''শুনুন, শুনুন'' বলতে বলতে ছুটে এল। হাতে জলভরা প্লাস্টিকের দুটি গ্লাস।

ওরা ঘুরে দাঁড়াল। এবং দুজনেই চিনতে পারল জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি হিয়া মিত্র।

''আপনারা জল চেয়েছিলেন না? আমাদের মিস নন্দী বড্ড কড়া মেজাজের। ওর ব্যবহারের জন্য মাপ চাইছি।''

হিয়া জলভরা একটা গ্লাস এগিয়ে ধরল কোনির সামনে। কোনি তখন অদ্ভুত আচরণ করে বসল। ধাঁ করে সে গ্লাসে আঘাত করল হাত দিয়ে। গ্লাসটা হিয়ার হাত থেকে ছিটকে ঘাসে পড়ল। হতভম্ভ শুধু হিয়াই নয়, ক্ষিতীশও।

''চাই না তোমাদের জল। আমাদের কলের জলই ভালো।''

কোনি হন হন করে একাই এগিয়ে গেল। ক্ষিতীশ অপ্রতিভ হয়ে বলল, ''আমি মাপ চাইছি এবার তোমার কাছে।''

হিয়া ব্যথিত মুখে বলল, ''এই গ্লাসের জলটা তাহলে আপনি খান।''

''নিশ্চয় নিশ্চয়।''

কোনিকে দারুণ বকবে ভেবেছিল ক্ষিতীশ। কিন্তু সে কিছুই বলেনি। হিয়াই যে কোনির ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী এটা ক্ষিতীশ বুঝে গেছে। বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবে চারদিন সে গেছে নিছকই পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করার ভান করে। হিয়ার ট্রেনিং সে দেখেছে। শুধু তাই নয়, পকেটে হাত ঢুকিয়ে লুকিয়ে স্টপওয়াচে হিয়ার পুরো দমে সাঁতারের সময় নিয়েছে। ক্ষিতীশের মনে হয়েছে, হিয়ার প্রতি কোনির হিংস্র আক্রোশটা ভোঁতা করে দেওয়া ঠিক হবে না। এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক। এটাই ওকে উত্তেজিত করে বোমার মতো ফাটিয়ে দেবে আসল সময়ে।

ক্ষিতীশ তাই বকুনি দেওয়ার বদলে বলেছিল, ''হিয়া তখন আমাকে কী বলল জানিস? বলল, মেয়েটা আমার কাছে মার খেয়েছে তাই জ্বলে পুড়ে মরছে।''

এরপর ক্ষিতীশ লক্ষ করল কোনি জল থেকে উঠতে দেরি করছে।

দুর্গা পুজোর আগেই ক্লাবগুলোর প্রতিযোগিতা একটার পর একটা হয়ে গেল। ক্ষিতীশ একটিতেও কোনিকে নামায়নি, এমনকি অ্যাপোলোর প্রতিযোগিতাতেও নয়। যদিও এখন তার সময় অমিয়ার সময়ের প্রায় সমান, তবু ক্ষিতীশের ধারণা এখনো তার প্রকাশের উপযুক্ত সময় আসেনি। হিয়ার সময় এখন কত, সেটা না জানা পর্যন্ত কোনিকে সে বার করতে চায় না। এখন অনেকেই জেনে গেছে ক্ষিতীশ একজন সাঁতারু তৈরি করছে। বালিগঞ্জ ক্লাবে সে গেলেই প্রণবেন্দুর নির্দেশে হিয়া এমনভাবে সাঁতার কাটে কিংবা জলে থেকে উঠে পড়ে, যার ফলে ক্ষিতীশ ওর সময় নিতে পারে না। হিয়াও কোনো প্রতিযোগিতায় নামেনি। তাইতে ক্ষিতীশ কিছুটা ভাবনায় পড়ল। প্রত্যেক ক্লাবের, এমনকি স্টেট চ্যামপিয়নশিপের ভিকট্রি স্ট্যান্ডেও অমিয়া আর বেলাকে উঠতে দেখা গেল।

একদিন খবরের কাগজে একটা খবর দেখে ক্ষিতীশ কেটে রেখে দিল। বোমবাইয়ের মহারাষ্ট্র স্টেট চ্যামপিয়নশিপে রমা যোশি নামে একটি মেয়ে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সময় করেছে এক মিনিট ১২ সেকেন্ড। এক-কুড়ির উপরে সময় করাই ভারতীয় মেয়েদের রেওয়াজ, সেখানে এক-বারো! ক্ষিতীশ এরপর কোনির ট্রেনিং আরো কঠিন করে তুলল।

এবার জাতীয় সাঁতার চ্যামপিয়নশিপ দিল্লিতে। পুজোর পর বাংলা দল রওনা হয়ে গেল। অমিয়া মেয়েদের দলের অধিনায়িকা। বাংলার মেয়েরা একটি সোনা, দুটি রূপো, দুটি ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরল। সোনাটি অমিয়ার, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে। রমা যোশি একাই ছয়টি সোনা জিতল চারটি ব্যক্তিগত রেকর্ড করে।

শীত এসে গেছে। কমলদিঘির জলও কমে গেছে। সোয়েটার পরা লোকেরা এখন সেখানে বেড়ায়। কেউ আর জলে নামে না। কিন্তু অব্যাহত কোনির দুবেলা জলে নামা। আপত্তি করেছিল অনেকেই। ক্ষিতীশ জবাবে শুধু বলেছে, ‘‘যদি পারে তাহলে নামবে না কেন? সারা বছরই ট্রেনিংয়ে থাকা দরকার। প্র্যাকটিশ চাই, প্র্যাকটিশ। মুভমেন্টগুলো যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, স্বাভাবিক হয়ে আসে। তা না হলে স্পিড বাড়ানো যাবে না। এদেশে মাত্র ছ’মাস সাঁতার হয়, তাই তো এই শোচনীয় দশা।’’

কোনিকে বাকি তিনটি স্ট্রোকও ক্ষিতীশ ইতিমধ্যে শিখিয়ে দিয়েছে। ফ্রি স্টাইল, বাটার ফ্লাই, ব্যাক এবং ব্রেস্ট এই চার রকমের স্ট্রোক মিলিয়ে কোনি এখন দিনে দু’মাইল হাড়ভাঙা সাঁতার কাটে। কঞ্চির মতো শরীরটার ওজন বেড়ে হয়েছে ৫০ কেজি।

বছর ঘুরে নতুন বছর এল।

একদিন ভেলো, প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়ানো ক্ষিতীশকে বলল, ‘‘ক্ষিদ্দা, এ বছর ওকে কম্পিটিশনে নামাবে তো?’’

ক্ষিতীশ তখন কোনির দুটো পায়ের গোছ বাঁধছিল রবারের দড়ি দিয়ে। পা বাঁধা অবস্থায় শুধু মাত্র হাতের পাড়িতে ওকে ‘পুল’ করতে হবে। ক্ষিতীশ অন্য মনস্কের মতো বলল, ‘‘সিজন শুরু হয়ে গেছে?’’

‘‘সিজন কী তোমার জন্য বসে থাকবে নাকি। কর্পোরেশন তো অনেকদিন কমলদিঘিতে জল ছেড়েছে, হুঁশ নেই —’’

ভেলো কথা থামিয়ে ফেলল। ক্ষিতীশ হাত তুলে রয়েছে। কোনি স্টার্টিং পজিশনে।

‘‘অন ইওর মার্ক .... গেট সেট .....’’ ক্ষিতীশ হাতটা নামাল। কোনি ঝাঁপাবার সঙ্গে সঙ্গে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে বলল, ‘‘কী বলছিলিস?’’

‘‘হরিচরণরা ভয় পেয়ে গেছে।’’

ভেলোর ধারেকাছে কেউ নেই, তবু সে এধার ওধার তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, ‘‘অমিয়া ও বেলা জুপিটারে আবার চলে এসেছে তো, সে খবর রাখো কি? ওদের ট্রেনিং চার্ট তৈরি করছে হরিচরণ। অমিয়া বলছে অতো ট্রেনিং লোড নিতে পারব না। তাই নিয়ে হরির সঙ্গে তক্কাতক্কি হয়েছে। হরি বলেছে, যদি ক্ষিদ্দার মেয়েটার হাতে মার না খেতে চাস তো হার্ড ট্রেনিং আরম্ভ কর।’’

‘‘করেও কোনো লাভ নেই। কোনি এখন যে টাইম করছে, অমিয়ার পক্ষে সেখানে পৌঁছনো সম্ভব হবে না।’’

‘‘তা হলে এবার ওকে জুপিটারের চ্যামপিয়নশিপে নামিয়ে, অমিয়াকে মার খাওয়াও। মনে আছে কী বলে অপমান করেছিল!’’

জলে কোনির দিকে চোখ রেখে ক্ষিতীশ জবাব দিতে ভুলে গেল। ভেলো ধড়মড়িয়ে বলল, ‘‘যা বলতে এসেছিলুম সেটাই বলা হয়নি। আর একটা দরজির দোকান ঠিক করেছি। দিনে প্রায় হাপ কেজি মাল হয়। ওরা তোমার জন্য রেখে দেবে, তুমি কালই যেও। এই নাও ঠিকানাটা।’’

ভেলো চলে যাবার পর ক্ষিতীশ স্টার্টিং ব্লকের উপর বসে ওর কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল। তখনই দেখল ধীরেন ঘোষ আর বদু চাটুজ্জে কমলদিঘির পশ্চিম গেট দিয়ে ঢুকে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকেই।

‘‘ক্ষিদ্দা দেখছি উঠে-পড়ে লেগেছে। কদ্দুর হলো?’’

ক্ষিতীশ যথাসম্ভব নিরাসক্ত হবার চেষ্টা করে ধীরেনকে বলল, ‘‘কীসের কদ্দুর!’’

‘‘এই তোমার চ্যাপিয়ন তৈরি করার। এবার দিল্লিতে দেখলুম বোমবাইয়ের রমা যোশিকে। অসাধারণ, ফ্যান্টাস্টিক। ইন্ডিয়ায় এ রকম মেয়ে সুইমার কখনো হয়নি।’’

‘‘হ্যাঁ, ভালোই টাইম করেছে।’’ ক্ষিতীশ নিষ্প্রাণস্বরে বলল।

‘‘তোমার এই গঙ্গা থেকে কুড়োনো মেয়েটা কেমন টাইম করছে?’’ বদু চাটুজ্জে নস্যির ডিবেটা রেলিংয়ে ঠুকে ঢাকনিটা খুলতে খুলতে বলল, ‘‘ডন ফ্রেজারের টাইম ধরে ফেলেছে?’’

‘‘আর একটু বাকি আছে। কাল পরশুই ধরে ফেলবে।’’ ক্ষিতীশের চোখ জোড়া মিটমিট করে উঠল।

কোনি তখন কিকিং বোর্ড ধরে স্প্রিন্ট করে যাচ্ছে। বদু চাটুজ্জে সেদিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘ঠাট্টা করলে আমার সঙ্গে!’’

‘‘ঠাট্টা! জলে নেমে এক বছরেই ডনের টাইম ধরে ফেলেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। এমন সিরিয়াস কথার পর কি ঠাট্টা চলে? ‘‘আগে অমিয়াকে বিট করুক, তারপর বড়ো বড়ো ব্যাপার ভাবা যাবে।’’

‘‘তা বটে।’’ ধীরেন ঘোষ বিজ্ঞের মতো বলল। ‘‘তবে অমিয়াকে বিট করা আর সম্ভব হলো না। এইটেই ওর লাস্ট সিজন। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, বিয়ের পরই চলে যাবে কানাডায়।’’

ক্ষিতীশ সচকিত হয়ে উঠল। কোনি যদি অমিয়াকে না হারায়, তাহলে বিরাট একটা অপূর্ণতা ক্ষিতীশের জীবনে যেন রয়ে যাবে। চিরকাল যেন তাকে অতৃপ্ত থেকে যেতে হবে।

‘‘তাহলে কোনিকে এবার তো নামিয়ে জানতে হয় বেঙ্গল চ্যামপিয়নের থেকে কত পিছনে রয়েছে।’’

‘‘না না, তা করতে যেও না।’’ বদু চাটুজ্জে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ‘‘সবে শুরু করছে। বাচ্চা মেয়ে এখুনি বড়ো রকমের মার খেয়ে গেলে সেটব্যাক হবে। তাতে ওর ক্ষতিই হবে।’’

‘‘হোক। তবু তো পরে বলতে পারবে, অমিয়ার পা ধোয়া জল খেয়েছি।’’

সেইদিনই নকুল মুখুজ্জেকে ক্ষিতীশ জানাল, এবার জুপিটারের কম্পিটিশনে কোনির এন্ট্রি অবশ্যই যেন দেওয়া হয়।

ক্ষিতীশ এবার আরো সতর্ক, আরো হিসেবি, আরো কঠিন হলো কোনির ট্রেনিং সম্পর্কে। তীক্ষ্ণ নজর রাখল কোনির হাবভাব, শোয়া, খাওয়া এবং বিশ্রামের দিকে। প্রতিমাসে একবার রক্তে হেমোগ্লোবিনের মাত্রা পরীক্ষা করে পরিশ্রমের ভার বাড়িয়ে যেতে লাগল। অ্যাপোলোর ছেলেদের সঙ্গে এখন তাকে প্রতিযোগিতা করিয়ে সময় নেয়। ক্ষিতীশ একদিন কাগজে বড়ো অক্ষরে লাল কালিতে ‘৭০’ লিখে ক্লাবের বারান্দায় দেয়ালে সেঁটে দিল। কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে সে হেসে বলল, ‘‘অত বছর আমায় বাঁচতে হবে কিনা, সেটা যাতে মনে থাকে তাই চোখের সামনে রাখলাম রোজ দেখার জন্য।’’

আসলে ওটা হচ্ছে ৭০ সেকেন্ড। সময়টা কোনির চোখে প্রতিদিন ভাসিয়ে রাখার জন্য শুধু ক্লাবেই নয়, বাড়িতেও দেয়ালে লিখে রেখেছে। রমা যোশি এখন লক্ষ্যের পাত্রী। এক মিনিট ১০ সেকেন্ডে কোনিকে এই বছরই সাঁতরাতে হবে।

‘‘অসম্ভব বলে কিছু নেই রে।’’ কোনিকে রাত্রে খাওয়ার পর বাড়ির পৌঁছে দেবার সময় ক্ষিতীশ বলে, ‘‘বুঝলি, আমাদের শত্রু হচ্ছে সময়। এই ঘড়িটা।’’

ক্ষিতীশ পকেট থেকে স্টপ ওয়াচটা বার করে কোনির চোখের সামনে ধরে। কোনি সেটা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে দেখতে থাকে। বারবার চাবি টিপে দেখে কাঁটাটা থরথরিয়ে কেমন এগোচ্ছে।

‘‘ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের দিকে এগোতে হলে, ছোটোখাট রেকর্ডগুলো ভাঙতে ভাঙতে এগোতে হবে।’’

‘‘ক্ষিদ্দা, অমিয়াদির রেকর্ড কবে ভাঙব?’’

ঘড়িটা কানে লাগিয়ে কোনি হঠাৎ প্রশ্নটা করল।

ক্ষিতীশ হেসে বলল, ‘‘কেন!’’

‘‘আজ দোকানে এসেছিল ব্লাউজ করাতে। আমাকে সকলের সামনে বলল, তুই এখানে ঝিয়ের কাজ করিস? জানো ক্ষিদ্দা, আমার খুব লজ্জা করল। আমার হাতের লেখাটা এত খারাপ, নইলে খাতায় মাপ লেখার কাজ করতে পারতুম। তুমি বৌদিকে একটু বলবে? আমি রোজ তাহলে হাতের লেখার প্র্যাকটিস করব।’’

‘‘বলব।’’ ক্ষিতীশ মৃদু স্বরে বলল। ‘‘লজ্জা কখনো পুরোটো জিততে পারবি না। কাউন্টারের ওধারে বসলে খানিকটা জেতা হবে। ক্ষমতা দিয়ে জিততে হয়। তোর আসল লজ্জা জলে, আসল গর্বও জলে। যখন তোর ক্ষমতা খানিকটা বাড়াতে পারবি, শুধু তোর কেন, তখন আমারও মান তাতে বাড়বে, মানুষের মান বাড়বে।’’

‘‘মানুষেরও!’’ কোনি হকচকিয়ে বলল।

ক্ষিতীশ ওর পিঠে চাপড় দিয়ে ঝুঁকে ভারী গলায় বলল, ‘‘হ্যাঁ, মানুষেরও। মানুষ শব্দের থেকে জোরে আকাশে উড়েছে, দশ সেকেন্ডের কমে ডাঙায় একশো মিটার ছুটছে, জলে মেয়েরা এক মিনিটের বাধা ভেঙেছে। স্বপ্নেও ভাবা যায়নি এমন সব পদ্ধতি লেবরেটরিতে, অপারেশন টেবলে মানুষ শিখছে এই শরীরের আয়ু বাড়াতে। একদিন আসবে যখন আলোর গতিকে মানুষ হার মানাবে, ইচ্ছামতো বয়সটা বাড়াবে। এই যে রেকর্ড ভেঙে মানুষ জলে, স্থলে, আকাশে এগোচ্ছে, এ সবই মানুষের মুক্তির চেষ্টা, এই ঘড়িটার হাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। একদিন সব ঘড়ি ভেঙে চুরমার করে দেবে মানুষ, সময়কে হারিয়ে দেবে মানুষ —’’

''ক্ষিদ্দা, কাঁধে লাগছে।'' কোনি অস্ফুটে কাতরে উঠল। কোনির কাঁধে উত্তেজিত আঙুলগুলো চেপে বসে গেছে। ক্ষিতীশ লজ্জা পেয়ে হাতটা নামিয়ে নিল।

''অনেক সময় আবোলতাবোল বকি। তুই এসব কথা বুঝতে পারিস?''

কোনি মাথা নাড়ল। ক্ষিতীশ যেন তাতে নিশ্চিত হলো, এমন স্বরে বলল, ''তোর পক্ষে এসব শক্ত কথা। তবে আরো বড়ো হ, বুঝতে পারবি।''

''ক্ষিদ্দা, তুমি কিন্তু বললে না, আমার টাইম অমিয়াদির রেকর্ডের থেকে কত পেছনে।''

''বলব বলব, একেবারে কম্পিটিশনেই দেখিয়ে দেবো ব্যাটাদের, কে কার পায়ের জল খায়।''

এর তিনমাস পরই ক্ষিতীশ অ্যাপোলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, ''বদমাইসি, এসব হচ্ছে ধীরেনের বদমাইসি। কোনির এন্ট্রি নেবে না কেন? অ্যাপোলোর সঙ্গে ঝগড়া, তাই বলে সুইমারদের ওপর ঝাল ঝাড়বে! প্রোটেস্ট করো, ইনজাংশন দাও ...যা খুশি ইচ্ছে মতো করবে, এটা কি মগের মুল্লুক!''

নকুল মুখুজ্জে আর বিষ্টু ধর এবং আরো অনেকে সেখানে বসে। ক্ষিতীশ পায়চারি করছিল, থমকে জুপিটার ক্লাবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ''কোথায় নেমে গেছে — অপদার্থরা ক্লাবটাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে! এখন ভয়ে ইতরোমো শুরু করেছে। ভেবেছে এইভাবে ক্ষিতীশ সিংগীকে আটকাবে।''

ফিসফিস করে বিষ্টু ধর বলল, ''এসব বিনোদ ভড়ের পরামর্শে হয়েছে। পাবলিককে এটা জানানো উচিত। প্রেস কনফারেন্স ডাকব আমি।''

নকুল মুখুজ্জে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

''এন্ট্রি রিফিউজ করার অধিকার ক্লাবের আছে। ওরা বলেছে ডেট পেরিয়ে গেছে তাই নেবে না। লাস্ট ডেট কবে সেটা তো ওরা বলে দেয়নি, সুতরাং আইনের ফাঁক রেখেছে। প্রোটেস্ট, ইনজাংশন কিছুই চলবে না।''

''এটা মরালিটির ব্যাপার।'' ক্ষিতীশ অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের বুকে চাপড় দিল। ''এটা খেলার, এটা সাহসের, এটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার।''

নকুল মুখুজ্জের ঠোঁট বিদ্রূপে মুচড়ে উঠল। বিষ্টু ধর উত্তেজিত হয়ে বলল, ''তাহলে একটা ডিমনস্ট্রেশন করলে কেমন হয়। বিক্ষোভ প্রতিবাদ জুপিটারের সামনে, বিনোদ ভড়ের বাড়ির সামনে? একটা মিছিলও যদি পাড়ায় পাড়ায় —''

''ওতে অনেক ঝামেলা।'' নকুল ঠান্ডা স্বরে বিষ্টু ধরকে মিইয়ে দিল। ''জুপিটারেরই পাবলিসিটি হবে, ওদের ইজ্জৎ একটুও তাতে কমবে না। আপনার ইলেকশন পর্যন্ত লোকে এসব মনেও রাখবে না। তার থেকে বরং অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে। ক্ষিতীশ, তুই কি নিশ্চিত যে, কোনি এখন অমিয়াকে হারাতে পারে?''

''নিশ্চয়।'' ক্ষিতীশ বলল দাঁতে দাঁতে চেপে।

''কম্পিটিটরস ফর দ্য লেডিজ হান্ড্রেজ মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট, প্লিজ কাম টু দিয়ার স্টার্টিং ব্লকস্।''

জুপিটার সুইমিং ক্লাবের কম্পিটিশন প্রতিবছরই এই রকম জাঁকালোভাবে হয়। কমলদিঘির অর্ধাংশের চারটে গেট বন্ধ করে, জুপিটারের অংশটুকু টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে। কাঠের গ্যালারি তৈরি করা হয় দিঘির তিন-চতুর্থাংশ ঘিরে। সাঁতার শুরু হয় যেদিকের প্লাটফর্ম থেকে, তার পিছনে তিন সারি বিশিষ্ট অতিথিদের চেয়ার এবং তার পিছনেও গ্যালারি। প্ল্যাটফর্মের একধারে টেবিলে। সেখানে মাইক্রোফোন নিয়ে ঘোষক আর জন্য পাঁচেক টাইম রেকর্ডার। বুকে ব্যাজ ঝুলিয়ে, কয়েকটা স্যুভেনির হাতে ধীরেন ঘোষ বিশিষ্ট অতিথিদের তদারকিতে ব্যস্ত। কম্পিটিশনের চিফ রেফারি হরিচরণ।

ভিড়ে আজ ফেটে পড়ছে কমলদিঘি। গ্যালারি ভেঙে কয়েকজন মাটিতে পড়েছে, একজনের হাত ভেঙেছে। রেলিংয়ের ভিতরে পাড় ঘিরে লোক দাঁড়িয়ে। দুটি ছেলে ভিড়ের ধাক্কায় জলে পড়েছিল। অবশ্য তারা সাঁতার জানে। ডাইভিং বোর্ডে উঠেছে বহু ছেলে। জুপিটারের এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ টিনের বেড়ার পরেই অ্যাপোলোর এলাকায়, রেলিং ঘিরে হাজার দুয়েক মানুষ। তারা দূর থেকেই প্রতিযোগিতা দেখবে।

প্রতিযোগিতার আজ শেষ দিন। দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হয়েছে। ছেলেদের এবং ছোটো মেয়েদের তিনটি বিষয়ের ফাইনাল হয়ে যাবার পর ঘোষণা শোনা গেল: ''কম্পিটিটরস ফর দ্য লেডিজ হান্ড্রেড মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট, প্লিজ...। উইল কম্পিটিটরস কাম টু দিয়ার পোজিশনস? দিস ইজ সেকেন্ড কল.....''

কমলদিঘির অ্যাপোলোর অংশে এতক্ষণ একজন, পাড়ের কাছে মন্থরভাবে সাঁতার কাটছিল। অ্যাপোলের স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মটা জুপিটারেরই পঞ্চাশ মিটার পাশে। সেখানে চুপচাপ বসে চোখে পুরু কাঁচের চশমা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল একটি লোক! কেউ তাকে লক্ষ করছে না। আজ কমলদিঘির আনাচে-কানাচে সর্বত্রই লোক, সকলের চোখ জুপিটারের এলাকার দিকে।

ঘোষণা শেষ হতেই ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল।

''কোনি!'' শান্ত নরম গলায় সে ডাকল। জল থেকে কোনি প্ল্যাটফর্ম উঠে এল। রেলিংয়ের ভীড়ের চোখ এদিকে ফিরল।

জুপিটারের প্ল্যাটফর্মে সাঁতারুরা এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয়াকে দেখা গেল হেসে কথা বলছে অতিথিদের মধ্যে বসা এক বৃদ্ধার সঙ্গে। অত্যন্ত ঢিলেঢালা নিশ্চিত ভঙ্গি। বেলা জলে নেমে মিনিট দুয়েক হাত ছুঁড়ে উঠে এল। এখন তোয়ালে দিয়ে জল মোছায় ব্যস্ত। অন্য ছয়টি মেয়ে কিঞ্চিৎ নার্ভাস। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করেই মুখ শুকিয়ে ফেলেছে।

হরিচরণ উত্তেজিতভাবে ধীরেন ঘোষের কানে ফিসফিসিয়ে কী বলল। ধীরেন ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাপোলোর প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। সেটা লক্ষ করে অমিয়াও তাকাল। পাঁচ নম্বর ব্লকের পিছনে দাঁড়ানো কালো কস্ট্যুম পরা মেয়েটিকে চিনতে তার অসুবিধা হলো না। কোনির পাশে ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ। সারা কমলদিঘি হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে, এবার একটা কিছু ব্যাপার হতে চলেছে। চোখ গুলো আপোলোর দিকে নিবন্ধ হচ্ছে।

হরিচরণ কিছু একটা অমিয়াকে বলতেই অমিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল। অ্যাপোলো ক্লাবের বারান্দা থেকে বিষ্টু ধরের চিৎকার ভেসে এল: ''ডাউন দিতেই হবে, কোনি।''

‘‘অন দ্য বোর্ড।’’ স্টার্টারের চিৎকার শোনা গেল। এয়ার রাইফেলের নলটা আকাশমুখো তোলা। জুপিটারের ব্লকের উপর আটটি মেয়ে উঠল। অ্যাপোলোর পাঁচ নম্বর ব্লকে উঠেছে কোনি। সারা কমলদিঘি ঘিরে ভেসে উঠল মর্মর শব্দ।

ওরা ব্লকের কিনারে পায়ের আঙুলগুলো আঁকড়ে রেখে হাঁটু ভেঙে, কাঁধ ঝুঁকিয়েছে। দু’হাত পাখির ডানার মতো পিছনে — যেন এখনি উড়বে।

‘‘গেট.. সেট...’’

অমিয়া ও কোনি ছাড়া বাকি মেয়েরা ঝপঝপ জলে পড়ল। এয়ার রাইফেলের ক্যাপ ফোটেনি। কমলদিঘি ঘিরে বিদ্রূপ ও আক্ষেপ এক চক্কর ঘুরে গেল। অমিয়া আড়চোখে কোনির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

নতুন ক্যাপ লাগানো হয়েছে।

‘‘অন দ্য বোর্ড।’’

মেয়েরা আবার ব্লকের উপর উঠল।

‘‘গেট... সেট...।’’

এয়ার রাইফেলে ‘ফটাশ’ শব্দ হলো।

এক সঙ্গে নয়টি মেয়ে জলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কমলদিঘির উপর গড়িয়ে পড়ল চাপা একটা গর্জন। দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়েছে ফুটবল মাঠের মতো। তাদের চোখ ডাইনে-বামে ৫০ মিটার যাতায়াত করছে আগুয়ান দুটি সাঁতারুকে লক্ষ করতে করতে।

তিরিশ মিটার পর্যন্ত কোনি আর অমিয়া সমান রেখায়। বাকিরা ৭/৮ মিটার পিছনে। এরপর অমিয়া একটু একটু করে এগোতে শুরু করল।

‘‘কোও-ও-নিই।’’ অ্যাপোলোর দিকে ভীড়ের মধ্যে থেকে কে চিৎকার করে উঠল। ‘‘কোও-ও-নিইই।’’

‘‘গো, অমিয়া গো।’’ জুপিটার থেকে চিৎকার শোনা গেল।

ক্ষিতীশ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে কোনির দিকে তাকিয়ে। মুখে ভাবান্তর নেই।

অমিয়া দু'হাত এগিয়ে গেছে। বেলা তার পিছনে প্রায় আট মিটার দূরত্বটা সমানে রেখে চলেছে। বাকিদের দিকে কেউ তাকাচ্ছেই না।

অমিয়া সবার আগে ৫০ মিটার বোর্ড ছুঁয়েছে। ঘুরে গিয়ে সে কোনিকে অতিক্রম করার সময় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কোনি যেন থমকে গেল। তারপরই বোর্ড ছুঁয়ে ঘুরেই টর্পেডোর মতো ছিটকে এল।

রোগতপ্ত মানুষের মতো কমলদিঘি ভুল বকতে শুরু করেছে।

''কোও-ও-নিই।''

''এটা ছেলে না মেয়ে, মশাই!''

''মেয়ে মেয়ে, আমাদের ক্লাবের মেয়ে — কোনি।''

''পারবে না। এক বডি পেছনে পড়ে গেছে। কেন যে ক্ষিদ্দা এমন হাস্যকর ব্যাপার করল।''

৬০ মিটার। অমিয়া এগিয়ে চলেছে।

৬৫ মিটার। কোনি উঠছে।

৭০ মিটার। কোনি সমান রেখায় অমিয়ার সঙ্গে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য অমিয়া ঘনঘন হাঁ করছে। পায়ের পাড়ি এলোমেলো হয়ে এসেছে। হাত দুটো উঠছে-পড়ছে যেন নিয়ম রক্ষার জন্য। জলের গভীরে ডুবিয়ে টেনে কোমরের পিছন পর্যন্ত আনার জোরটুকু আর নেই। অমিয়া নিভে আসছে।

''কাম অন অমিয়া, কাম অন বেঙ্গল চ্যামপিয়ন।''

''ফাইট কোনি, ফাইট।''

হঠাৎ কমলদিঘি ঘিরে বিরাট একটা চিৎকার হাউইয়ের মতো আকাশে উঠল। কোনি পিছনে ফেলেছে অমিয়াকে। ওর ছিপছিপে শরীরটার মধ্যে দিনে দিনে সঞ্চিত যন্ত্রণায় ঠাসা শক্তির ভাণ্ডারটিতে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামা করে চলেছে দুটি হাত, তার সঙ্গে তাল রেখে চলেছে পা দুটি; ওর দু'পাশে ইংরাজি 'ভি' অক্ষরের মতো ঢেউয়ের রেখা ছড়িয়ে পড়ছে। পায়ের আঘাতে বিরামহীন স্ফীত জলতরঙ্গ ওকে অনুসরণ করছে।

মসৃণ, স্বচ্ছন্দ কিন্তু হিংস্র ভঙ্গিতে কোনি নিজেকে টেনে বার করে নিয়ে গেল। ফিনিশিং বোর্ডে হাত লাগিয়েই সে উদ্বিগ্ন ব্যগ্র চোখে পাশে মুখ ফেরাল। তখনো অমিয়া পৌঁছয়নি। 'উইইই' শব্দে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে কোনি চিত হয়ে বোর্ডে পায়ের ধাক্কা দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আনন্দে।

''তিন বডি, ক্লিয়ার তিন বডিতে মেরেছে।''

''কোওওন্নি.....কোওওন্নি।'' ভীড়ের মধ্যে তিনটি ছেলে তালে তালে সুর করে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কোনি হাত নাড়ল তাদের উদ্দেশে।

''কী রকম ডাউন খাওয়াল দেখলে! জুপিটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারই শোধ নিল।''

''অনেকদিন এমন মজা পাইনি কিন্তু!''

হঠাৎ সব আলোচনা, উত্তেজনা থমকে গিয়ে এবার দ্বিগুণ জোরে হৈ হৈ চিৎকার উঠল। হাততালি পড়ছে, শিস উঠছে একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। অ্যাপোলোর স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে এতক্ষণ ধরে প্রস্তরবৎ, ভাবলেসহীন ক্ষিতীশ এখন তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে।

''কোথায় হরিচরণ, মুখখানা একবার দেখা।'' লাফাতে লাফাতে ক্ষিতীশ চিৎকার করে চলল। ''ওলিম্পিকের গুল মেরে কি আর সুইমার তৈরি করা যায় রে পাঁটা? বুদ্ধি যাই, খাটুনি চাই, নিষ্ঠা চাই...গবেট গবেট সব।''

ব্যস্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর ভেলো উঠে এসে ক্ষিতীশকে জড়িয়ে ধরল। ''হচ্ছে কী ক্ষিদ্দা, এত লোকের সামনে, তোমার কি মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি! চলো চলো, ক্লাবে চলো। বিষ্টু ধর ওদিকে একসাইটমেন্টে সেন্সলেন্স হয়ে পড়েছিল। অ্যাই কোনি, উঠে আয়।''

ক্লাবের বারান্দায় বেঞ্চে শুয়েছিল বিষ্টু ধর। ক্ষিতীশকে দেখে ওঠার চেষ্টা করতেই দু'জন তাকে সাহায্য করল।

''দশ কেজি রসগোল্লা আনতে পাঠিয়েছি।'' ক্ষীণস্বরে বিষ্টু ধর বলল। ''ব্যান্ড পার্টি আনাব। কোনিকে সারা নর্থ ক্যালকাটা ঘোরাব।''

''খবরদার, ও কাজটি করবেন না। তাহলে হাজার পাঁচেক ভোট কমে যাবে।''

বিষ্টু ধর ফ্যালফ্যাল করে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে থেকে, অস্ফুটে আপন মনে বলল, ''কিন্তু আমার যে জেনুয়িন আনন্দ হচ্ছে।''

ক্ষিতীশ কোনিকে ডেকে গম্ভীর মুখে বলল, ''টার্নিংয়ের ভুল হলো কেন?''

''তখন কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। অমিয়াদি টার্ন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, টাম্বল টার্নের কথা আর মনেই এল না।''

''আসলে নিজের ওপর তখন ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলিস। মনে এলে সময় আরো কমতো।''

''আমার সময় কত হলো ক্ষিদ্দা?''

বুক পকেট থেকে ঘড়ি বার করে তাকিয়েই ক্ষিতীশ ভ্রূ কঞ্চিত করল এবং ক্রমশ মুখটা অপ্রতিভ হয়ে উঠল।

''ভুলে গেছি রে! ফিনিশের সময় এমন একসাইটমেন্ট চারদিকে ..... তবে বেঙ্গল রেরর্ড নিশ্চয় আজ ভেঙেছিস। ইস্‌স, সময়টা যদি রাখতুম।''

''ক্ষিদ্দা, আমায় যে এখন প্রজাপতিতে যেতে হবে, দেরি হলে বৌদি রাগ করবে।''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেরি করিসনি আর।'' ক্ষিতীশ ব্যস্ত হয়ে বলল। কিন্তু কোনি ইতস্তত করছে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ''কী হলো?''

''কানে কানে বলব।''

ক্ষিতীশ নিচু করল মাথাটা।

''রসগোল্লা আনতে পাঠিয়েছে না!''

''তাই তো! নিশ্চয় ভেলোটা আনতে গেছে। তাহলে আজ আর তোর বরাতে রসগোল্লা নেই।''

''কে বললে নেই।'' বিষ্টু ধর গর্জন করে উঠল। ''ব্যান্ড পার্টি ঘোরানো গেল না, রসগোল্লার হাঁড়িটাই তার বদলে প্রজাপতি ঘুরে আসবে।''

''তাহলে তোর বৌদির রাগও জল হয়ে যাবে।''

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশের প্রতি লীলাবতীর প্রথম উক্তি হলো: ''অতলোকের সামনে এই বুড়ো বয়সে ধেই ধেই করে নাচছিলে কেন? লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। সবার সামনে অসভ্যতা, দোকানের মেয়েরাও দেখল তো!''

ক্ষিতীশ মাথা চুলকোতে চুলকোতে কোনির দিকে তাকাল। ''তোর বৌদি জানল কী করে?''

ফিসফিস করে কোনি বলল, ''বৌদি দেখতে গেছল। আমি বলেছিলুম আজকের সাঁতারের কথাটা, নইলে ছুটি পেতুম না যে।'' তারপর হেসে বলল, ''বৌদি আমার মাপ নিয়েছে, একটা ফ্রক করে দেবে।'' লাজুক স্বরে বলল, ''বৌদি বলেছে, ইন্ডিয়া রেকর্ড করলে সিল্কের শাড়ি দেবে।''

কোনিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, ''কী মনে হচ্ছিল রে তোর, যখন সাঁতরাচ্ছিলিস।''

কোনি অনেকক্ষণ চুপ করে হাঁটল, তারপর স্বপ্নের ঘোরে যেন কথা বলছে, এমনভাবে বলল, ''জানো ক্ষিদ্দা, রোজ যখন প্র্যাকটিস করি, তখন জলের মধ্যে নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুখও এগিয়ে চলেছে। বড্ড ভয় করে তখন।''

''মুখটা কেমন দেখতে রে?''

''দাদার মতন। আজও ছিল আমার সঙ্গে।''

অবশেষে কোনি বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল।

এবারের জাতীয় সাঁতার চ্যামপিয়নশিপ হচ্ছে মাদ্রাজে। বি এ এস এ নির্বাচন সভায় ধীরেন ঘোষ, বদু চাটুজ্জেরা প্রবল বিরোধিতা করেছিল অ্যাপোলোর কাউকে দলে নেওয়ায়। শুধু তাই নয়, জুপিটারের কম্পিটিশনে অ্যাপোলোর তরফ থেকে ‘‘অমার্জনীয় অখেলোয়াড়ি আচরণ করার জন্য’’ ওই ক্লাবকে সাসপেন্ড করা হোক দাবিও তোলে।

জুপিটার দলে ভারী ছিল, তাদের প্রস্তাব গৃহীতও হচ্ছিল। এমন সময় আচমকা বালিগঞ্জ ক্লাবের প্রণবেন্দু বিশ্বাস অর্থাৎ হিয়ার কোচ প্রস্তাব দিল, ‘‘অ্যাপোলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হোক, ভবিষ্যতে এই ধরনের আচরণ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ প্রণবেন্দু তারপর বলল, ‘‘বেঙ্গলের স্বার্থেই কনকচাঁপা পালকে টিমে রাখতে হবে।’’

তুমুল হৈচৈ পড়ে গেল প্রণবেন্দুর এই কথায়। অ্যাপোলোর কোনো প্রতিনিধি সভায় নেই। ওরা ভেবেছিল প্রস্তাবনা বিনা বাধায় পাশ হয়ে যাবে। কেউ ভাবতেই পারেনি হিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ নিয়ে প্রণবেন্দুই কিনা লড়াই শুরু করবে। ধীরেন ঘোষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, ‘‘স্টেট চ্যামপিয়নশিপে কী হলো, সেটা তো তুমি নিজেই দেখেছ।’’

‘‘হ্যাঁ দেখেছি।’’ প্রণবেন্দু স্থির চোখে ধীরেনের পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলল, ‘‘কী হয়েছিল আমি দেখেছি।’’

শুধু প্রণবেন্দু নয়, আরো অনেকেই দেখেছে।

কোনির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমিয়ার সঙ্গে নয়, হয়েছিল হিয়ার সঙ্গে। ব্রেস্ট স্ট্রোকের ১০০ মিটারে ছিল কোনি, অমিয়া, হিয়া। চ্যামপিয়নশিপের অন্যতম রেফারি ছিল ধীরেন ঘোষ। স্ট্রোক জাজদের মধ্যে ছিল হরিচরণ, ইনসপেক্টর অফ টার্নস এবং টাইম কিপারদের মধ্যে কার্তিক সাহা, বদু চাটুজ্জে, যজ্ঞেশ্বর ভটচাজ ছাড়াও জুপিটারের গোষ্ঠিভুক্ত কয়েকটি ক্লাবের লোকেরা ছিল।

একই সঙ্গে কোনি আর হিয়া ৫০ মিটার থেকে টার্ন নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বদু চাটুজ্জে লাল ফ্ল্যাগ নাড়তে শুরু করে। রেফারি ধীরেন ঘোষ ছুটে গিয়ে ফ্ল্যাগ দেখাবার কারণটা জেনে, বলল, ‘‘কনকচাঁপা পাল ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে। টার্ন করেই আন্ডারওয়াটার ডাবল-কিক নিয়েছে।’’

শুনে অবাক হয়ে গেল ক্ষিতীশ। শুধু বলল, ‘‘এরকম ভুল করার কথা তো নয়।’’

হিয়া প্রথম এবং তার থেকে ৬ মিটার পিছনে কোনি ৭ মিটার পিছনে অমিয়া সাঁতার শেষ করে। কোনিকে ২০০ মিটারে নামতে দেয়নি ক্ষিতীশ। ব্রেস্ট স্ট্রোকে পায়ের উপর অত্যধিক খাটুনি পড়ে, অথচ তার পরেই ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট। কোনি মূলত ফ্রি স্টাইলার। কিন্তু এতেও কোনি পারল না। সাঁতার শেষ করে ফিনিশিং বোর্ড ছুঁয়েই সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল অমিয়া হাত ছোঁয়াল। কোনি একগাল হেসে মুখ তুলে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। ঘড়িটা উঁচু করে ধরে গ্যালারি থেকে ক্ষিতীশ হাত নাড়ল। ঘোষণায় শোনা গেল অমিয়া প্রথম হয়েছে।

ক্ষিতীশ প্রথমে থ হয়ে গেল, তারপর ধীরেনের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, ‘‘এসব কী হচ্ছে?’’

‘‘কী আবার হবে!’’ ধীরেন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল, ক্ষিতীশ ওর হাত টেনে ধরল।

‘‘আমিও টাইম রাখছি। কোনি আগে টাচ করেছে, ওর টাইম —’’

‘‘তোমার জাপানি ঘড়ির টাইম তোমার কাছেই রাখো।’’

নকুল মুখুজ্জে প্রতিবাদ জানাল জুরি অফ অ্যাপিলের কাছে। প্রতিবাদ নাকচ হয়ে গেল। পনেরো মিনিট পরেই ছিল ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি। কোনি বাটার ফ্লাইয়ে হিয়া এবং অমিয়ার কাছে পিছিয়ে পড়ল, ব্যাক স্ট্রোকে অমিয়াকে ধরে ফেলে টার্ন নিতেই দেখা গেল যজ্ঞেশ্বর ভটচাজ লাল ফ্ল্যাগ তুলে রয়েছে।

‘‘ব্যাপার কী!’’ ক্ষিতীশ গ্যালারি থেকে নেমে এল। ‘‘ধীরেন জোচ্চুরির একটা সীমা আছে। জগু তো আগে থেকেই ফ্ল্যাগ তুলেছিল।’’

‘‘কে বলল আগে থেকে! তোমার মেয়েটা ফলটি টার্ন নিয়েছে, তারপর ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে। শেখাও শেখাও, টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো শেখাও। জুপিটারকে অপদস্থ করা ছাড়া আর কিছু তো শেখাওনি।’’ ধীরেন উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বকের মতো গলাটা লম্বা করে বলতে লাগল, ‘‘আইনটাও শিখো যে, ব্যাক স্ট্রোকে টার্ন নেবার জন্য বোর্ডে হাত ছোঁয়াবার আগে নরম্যাল পজিশন অন দি ব্যাক থাকতে হবে। কনকচাঁপা ঘুরে গিয়ে হাত ছুঁইয়েছে, নরম্যাল পজিশনে থেকে ছোঁয়ায়নি। যাও যাও, গিয়ে বোসো এখন।’’

হিয়ার কাছে অমিয়া হেরে গেল এক সেকেন্ডের তফাতে। কোনি আড়ষ্ট হয়ে গেল দু’বার বাতিল হয়ে এবং প্রথম হয়েও দ্বিতীয় হয়ে যাওয়ায়। বাড়ি ফেরার সময় ক্ষিতীশ বাসে সারা পথ গজরাল এবং অবশেষে বলল, ‘‘কাল হানড্রেড মিটার, দেখি ধীরেনরা কী করে তোকে আটকায়।’’

কিন্তু আটকাবার যে অনেক পন্থা আছে ক্ষিতীশ তা ভেবে দেখেনি।

পরদিন স্টার্টিং ব্লকে যখন প্রতিযোগীরা এসে দাঁড়াল, ক্ষিতীশ একটু অবাকই হলো। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিযোগীদের মধ্যে যারা সেরা তাদের মাঝখানে রাখা হয়, — ৩, ৪, ৫ নম্বর লেনে। হিয়া ৩ নম্বরে, কোনি ৪ নম্বরে, অমিয়া ৬ নম্বরে আর তাদের মাঝে জুপিটারের ইলা ৫ নম্বর লেনে। হিটে কোনোক্রমে তৃতীয় হয়ে ইলা ফাইনালে উঠেছে। দু’ বছর আগে প্রি-ইউ পরীক্ষায় টোকার সময় ধরা পড়ে ইলা গার্ডকে কামড়ে দিয়েছিল।

ক্ষিতীশ এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরেনের দিকে। একজন ভলান্টিয়ার তাকে আটকে দিয়ে বলল ‘‘প্ল্যাটফর্মে কম্পিটিটাররা আর অফিসিয়ালরা ছাড়া কেউ যেতে পারবে না।’’

ফিরে এসে ক্ষিতীশ ঘড়ি হাতে নিয়ে বসল। শুরু থেকেই প্রচণ্ড রেস। অমিয়া বদ্ধপরিকর চ্যামপিয়নশিপ বজায় রেখে সাঁতার থেকে বিদায় নিতে। হিয়া মসৃণ ছন্দোবদ্ধ এবং দ্রুততালে নিখুঁত ভঙ্গিতে ভেসে যাচ্ছে। কোনি যেন তাড়া খাওয়া ব্যস্ত উদ্বিগ্ন জলকন্যা। জল তোলপাড় করে সে যেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে। বাকিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ওই তিনজনের পিছনে অন্তত ২০ মিটারের মধ্যে থাকতে। ইলার ব্যস্ততাটা একটু কম, সে বরাবর মুখ তুলে তাকাচ্ছে আর ক্রমশই সরে যাচ্ছে কোনির লেনের দিকে।

বোর্ড ছুঁয়ে সবার আগে টার্ন নিল কোনি। তারপর অমিয়া। ব্রেস্ট স্ট্রোকাররা ভালো ফ্রি স্টাইলার হয় না — হিয়া প্রায় দু’ মিটার পিছিয়ে পড়েছে। বাকিরা তখনো ৪০ মিটারেও পৌঁছয়নি। টার্ন নিয়ে কোনি সবে মাত্র দু-তিনটি স্ট্রোক দিয়েছে, তখনই ব্যাপারটা ঘটল।

ইলা ঢুকে পড়েছে কোনির লেনে। দুজনে মুখোমুখি সংঘর্ষ! ‘‘উঃ’’ বলে কোনি চেঁচিয়ে উঠল একবার, দেখা গেল ওরা জড়াজড়ি অবস্থায় এবং হাঁকপাক করে সে যেন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেন্ড এভাবেই কাটল। ততক্ষণে অমিয়া এবং হিয়া ওদের অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। বদু চাটুজ্জে লাল ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে ইলার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘ইউ ডিসকোয়ালিফায়েড।’’ ইলা আবার নিজের লেনে সরে গিয়ে সাঁতার কেটে স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

কোনি শুধু একবার সামনে তাকিয়ে দেখল। তারপরেই বড়ো হাঁ করে অনেকখানি বাতাস বুকে ভরে নিয়ে তাড়া করল সামনের দুজনকে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবু শেষ চেষ্টা। এঞ্জিনের পিস্টনের মতো ওঠানামা করছে দুটো হাত, পায়ের কাছে টগবগিয়ে ফুটছে জল।

''কাম অন পল, কাম অন।'' দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাচ্ছে আর কেউ নয়, হিয়ার বাবা। গ্যালারির হতভম্ব ভাবটা তাতে যেন ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে পড়ল।

''জোরে জোরে, আরো জোরে!'' শুধু এই চিৎকার ধাপে ধাপে উঠে অবশেষে আক্ষেপে ভেঙে পড়ল। কোনি পারল না। অমিয়া তার খেতাব রক্ষা করল। দ্বিতীয় হলো হিয়া। কোনি তৃতীয় হলো বেলার সঙ্গে।

তারপর আর একটি ব্যাপার ঘটল। ধীরেন জলের ধারে ঝুঁকে এক গাল হেসে অমিয়াকে কিছু বলছিল, সেই সময় ভিড় ঠেলে ছুটে এসে ক্ষিতীশ তার পিছনে লাথি কষাল। ধীরেন উল্টে গিয়ে জলে পড়ল। তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটি ছেলে ক্ষিতীশকে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল সেখান থেকে। তখন শোনা গেল চিৎকার করে সে বলে যাচ্ছে, ''পারবি না, এভাবে পারবি না।...''

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কোনির তোয়ালে দিয়ে ক্ষিতীশ মুখ মুছল। ঠোঁটের কষ বেয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছে। কোনির কপাল ফুলে উঠেছে। একটা পানের দোকান দেখে ক্ষিতীশ বরফ কেনার জন্য দাঁড়াল। ঠিক তখনই ওর পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হিয়ার বাবা নেমে এল।

''সরি মিস্টার সিন্‌হা। এমন ডার্টি ব্যাপার এখানে হবে আমি জানতাম না। হিয়া, তার মা, আমরা কেউই খুশি হতে পারছি না। এভাবে মেডেল জেতায় কোনো আনন্দ নেই।''

ভদ্রলোক কোনির পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, ''দুঃখ কোরো না। জোরে সাঁতার কাটার দরকারটা আজ তুমি অনুভব করতে পেরেছ, তুমি লাকি। তোমার লাস্ট ফরটি মিটারস আমি ভুলব না।''

ক্ষিতীশ প্রথমে বিভ্রান্ত তারপর অভিভূত হয়ে গেল। গাড়ির জানলা দিয়ে হিয়া এবং তার মা দেখছে। ক্ষিতীশ এগিয়ে এসে হিয়ার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, ''বড়ো হও মা।'' তারপর ইতস্তত করে বলল, ''সেদিন কোনিকে আমি খুব বকেছি।''

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির ছেঁড়া বুক পকেটটা টান মেরে ক্ষিতীশ খুলে ফেলল।

''তোর বৌদিকে এসব কিছু বলিসনি।'' ...

প্রণবেন্দু ঘরের সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ''কী হয়েছিল, আমরা জানি। সেকথা এখন আলোচনা করে লাভ নেই। বাংলার মানসম্মানের কথাই এখন আমাদের ভাবতে হবে, টিমটা যাতে সেরা হয় তার জন্য তুচ্ছ দলাদলি ভুলে যেতে হবে। মহারাষ্ট্রই আমাদের মেয়েদের একমাত্র রাইভ্যাল। ওদের রমা যোশির সঙ্গে ফ্রি স্টাইলে পাল্লা দেবার মতো কেউ নেই, একমাত্র কনকচাঁপা পাল ছাড়া। ফ্রি স্টাইলে তিনটে ইনডিভিজুয়াল, আর একটা রিলে, এই চারটের মধ্যে অন্তত দুটোতে, একশো আর দু'শোয় কনকচাঁপার সিক্সটি পারসেন্ট চান্স আছে।''

''কীসে বুঝলে যে, আছে?'' একজন জানতে চাইল।

''শুধু ওর সেদিনের ফিনিশ করা দেখেই বুঝেছি। যেরকম রোখা জেদি সাঁতার ও দেখাল, তাতে স্প্রিন্ট ইভেন্টে ওর সমকক্ষ এখন বাংলায় কেউ নেই। আমি ওর ট্রেনিংয়ের খবর রাখি, দু-তিনবার দেখেও এসেছি, জোর দিয়েই বলছি মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে চ্যামপিয়নশিপ ছিনিয়ে নিতে হলে এই মেয়েটিকে চাই।''

''শুধু ফ্রি স্টাইল জিতেই আমরা চ্যামপিয়ন হয়ে যাবে?'' ধীরেন ঘোষ তাচ্ছিল্যভরে বলল এবং অন্যান্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো হাসল। কিন্তু তাকে সায় দিয়ে কেউ মাথা নাড়ল না এবার।

''হিয়ার কাছ থেকে আমি তিনটে গোল্ড আশা করছি। দুটো ব্রেস্ট স্ট্রোকে, একটা ব্যাক স্ট্রোকে। মেডলিতেও ফিফটি-ফিফটি চান্স আছে। এছাড়াও অঞ্জু, পুষ্পিতা, বেলা ও অমিয়া পয়েন্ট আনবে। এ বছর আমরা লেডিজ চ্যামপিয়ন হতে পারি।''

‘‘কিন্তু কনকচাঁপা পাল এ বছর কোনো ক্লাব স্পোর্টসে নামেনি, স্টেট চ্যামপিয়নশিপে দুটোতে ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে আর একটায় প্রথম দুটো প্লেসের মধ্যে আসতে পারেনি, বাকিগুলোয় আর নামেনি। ওর টাইমিং কী, আমরা তা জানি না। সুতরাং কী করে ওকে সিলেক্ট করা যায়!’’ ধীরেন ঘোষ টেবল ঘুঁষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল।

কয়েক সেকেন্ড সভাঘর নিস্তব্ধ রইল। সবশেষে ধীর শান্ত গলায় প্রণবেন্দু বলল, ‘‘তাহলে বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের সুইমারদের বাদ দিয়েই আপনাদের টিম করতে হবে। আমার মেয়েদের আমি উইথড্র করে নিচ্ছি।’’

‘‘তা কী করে হয়!’’ সভায় গুঞ্জন উঠল। একজন বলল, ‘‘কনকচাঁপা পালকে সিলেকশন দিলে ক্ষতিই বা কি! যাবে তো নিজের টাকায়।’’

এরপর শুরু হলো তর্কাতর্কি। সেটা পৌঁছল চিৎকারে। এক সময় ধীরেন রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলল, ‘‘প্রণবেন্দু ব্ল্যাকমেল করে অ্যাপোলোর সুইমার টিমে ঢোকাতে চায়। এতে ওর কী যে স্বার্থ আছে বুঝছি না।’’

প্রণবেন্দু জবাব দিল, ‘‘রমা যোশির সোনা কুড়োনো বন্ধ করা ছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ নেই।’’

কোনি মাদ্রাজ যাওয়ার মনোনয়ন অবশেষে পেল। বাংলা ম্যানেজার হয়েছে ধীরেন ঘোষ। মেয়েদের বিভাগে ম্যানেজার বেলেঘাটা সুইমিং ক্লাবের প্রণতি ভাদুড়ি এবং কোচ হরিচরণ মিত্র। মাদ্রাজ মেলে ওরা সন্ধ্যায় রওনা হবে। ক্ষিতীশ এসেছে ট্রেনে কোনিকে তুলে দিতে। আর এসেছে কান্তি, চন্ডু, ভাদু। কোনির ভাই গোপাল।

কামরায় জানলার ধারে বসেছে কোনি। জানলা থেকে দূরে সবার থেকে একটু তফাতে প্ল্যাটফর্মে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে। কোনি কথা বলছে কান্তিদের সঙ্গে। ধীরেন ঘোষ হাঁকডাক করে তদারকিতে ব্যস্ত। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসছে, এখনো নাকি কয়েকজন পৌঁছয়নি।

কোনির মুখে চাপা ভয়। কলকাতায় বাইরে সে কখনো যায়নি। সাড়ে চোদ্দোশো কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৩৫ ঘণ্টা ট্রেনে বাস। কামরার আর এক কোণে জুপিটারের অমিয়া আর বেলা। ওরা অভ্যস্ত। এটা ওদের পঞ্চম ন্যাশনাল চ্যামপিয়নশিপ। হিয়া বাবা-মার সঙ্গে দু-দিন পর প্লেনে যাবে।

কোনি কথা বলছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ক্ষিতীশের দিকে। তখন চোখ সরিয়ে নিচ্ছে ক্ষিতীশ।

‘‘মাদ্রাজ একেবারে সমুদ্রের ওপর। তবে নামিসনি যেন। গঙ্গা আর সমুদ্রে অনেক তফাত। সমুদ্রের তলায় কারেন্ট আছে।’’ ভাদু সাবধান করে দিল।

‘‘কোনি মুশকিলে পড়বি খাবার নিয়ে। ইডলি ধোসা যা জিনিস, খেলেই মালুম পাবি। বাঙালিদের পেটে ওসব ঠিক সহ্য হবে না। ওখানে পৌঁছেই খোঁজ করবি বাঙালি হোটেল-ফোটেল কোথায় আছে।’’ কান্তি পরামর্শ দিল।

‘‘না রে আমাদের সঙ্গে রান্নার জিনিসপত্তর, ঠাকুর সব যাচ্ছে।’’

‘‘তোর ভয় কচ্ছে?’’ ভাদু জিজ্ঞেস করল।

কোনি ছলছল চোখে তাকাল।

‘‘আরে ধেৎ, তোর থেকেও কত ছোটো ছোটো মেয়ে ওয়ার্ল্ড ঘুরছে একা। আর তুই তো অ্যাতোগুলো লোকের সঙ্গে যাচ্ছিস। ঘাবড়াসনি।’’ চন্ডু হাত ধরল কোনির।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। ক্ষিতীশ কথা বলছিল একজনের সঙ্গে। মুখ ফিরিয়ে দেখল। কোনি তার দিকে তাকিয়ে, দু’গাল বেয়ে জল পড়ছে।

‘‘ক্ষিদ্দা।’’ কোনি ধরা গলায় ডাকল।

ক্ষিতীশ না শোনার ভান করল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

"আমার ভয় করছে ক্ষিদ্দা।"

ট্রেনের সঙ্গে হাঁটছে কান্তিরা। মুখ কাত করে কোনি জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল ক্ষিতীশকে, দেখতে পেল না।

ঘণ্টা দুয়েক পর খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন থামল। কৌতূহলে কোনি প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ পাশ থেকে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল ক্ষিতীশ।

"ক্ষিদ্দা!" কোনির চিৎকারে শুধু কামরারই নয়, প্ল্যাটফর্মেরও অনেকে ফিরে তাকাল।

"মনে আছে তো ঠিক দশটায় ঘুমোবি।"

"না।" অবাধ্য গোঁয়ারের মতো কোনি ঘনঘন মাথা দোলাল। টপ টপ করে চোখ থেকে জল ঝরছে। "আমি কিচ্ছু শুনব না, করবও না। তুমি মাদ্রাজ যাবে, এটা আমার কাছে লুকিয়েছিলে কেন?"

একজন টিকিট চেকারকে এগিয়ে আসতে দেখে ক্ষিতীশ আড়ষ্ট হয়ে গেল। লোকটি তার পিছন দিয়ে চলে যাবার পর কোন কামরায় ওঠে, সেদিকে আড়চোখে নজর রাখতে রাখতে সে বলল, "যাচ্ছি কে বলল, এখান থেকেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব।"

"ইস্‌স্।" কোনি দু' হাতে আঁকড়ে ধরল ক্ষিতীশের পাঞ্জাবির হাতা। "যাও তো দেখি।"

"কেন আমি যাব! তুই কি কখনো আমার কথা ভাবিস?"

"ভাবি কি না ভাবি, তুমি তা জানো?"

"জানিই তো। জলে ডাইভ দিয়ে পড়ার পরই তো আমাকে ভুলে যাস।"

টিকিট চেকারটি আবার আসছে। কোনি উত্তর দেবার আগেই ক্ষিতীশ, "কাল সকালে বহরমপুরে আসব", এই বলেই সরে গেল।

কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হরিচরণ একজনকে বলল, "আপদটা দেখছি সঙ্গে চলেছে।"

কিন্তু সকালে ক্ষিতীশকে দেখা গেল না। বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য রাত্রেই চেকারের হাতে ধরা পড়ে সে তখন রেল পুলিশের হেফাজতে।

ঘরের একধারে এককোনে খাটে কোনি শুয়েছিল। রং ওঠা শতরঞ্চি আর বালিশ, গায়ে দেবার সুতির চাদর, মাথার কাছে টেবলে ক্যাম্বিসের ছোটো ব্যাগ। তাতে আছে গোটা দুয়েক ফ্রক, আর ওর সব থেকে মূল্যবান সম্পত্তির কস্ট্যুমটা। টেবলে মাজন, ব্রাশ আর অর্ধেক দাঁত পড়ে যাওয়া একটা চিরুনী। খাটের নীচে চটি।

দুই বাহুতে চোখ ঢেকে কোনি শুয়ে, আর অন্যান্য মেয়েরা তখন বাইরে থেকে ফিরল। ওরা মাদ্রাজ শহর দেখতে, বাজার করতে বেরিয়েছিল। কোনি যায়নি, হাতে মাত্র পনেরোটি টাকা, তাই নিয়ে বাজার করা যায় না। শহর দেখার ইচ্ছাও নেই। ওর সঙ্গে কেউ কথা বলে না, হাবেভাবে মেয়েরা বুঝিয়ে দেয় সে ওদের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কোনিও এড়িয়ে চলে ওদের।

আজ আবার সকালে বেরোবার সময়, বেলা হঠাৎ বলে, ‘‘প্রণতিদি, আমাদের সঙ্গে কোনি যাবে না?”

‘‘না বলছে তো, শরীর খারাপ, জ্বর-জ্বর লাগছে।”

খাটে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল কোনি।

‘‘তা হলে ঘরে কি ও একা থাকবে! কাল আমার ক্রিমের কৌটোয় খাবলা দেওয়া দেখেছি।”

‘‘ওম্মা, বেলাদি, আমারও যে পেস্টের টিউবটা অনেকখানি খালি। ভয়ে আমি বলিনি, কি জানি কে আবার কী মনে করবে!”

‘‘ঘরে তালা দিয়ে যাওয়া উচিত প্রণতিদি।”

‘‘তাহলে কোনি কোথায় থাকবে!” প্রণতি ভাদুড়ির কড়া স্বরে ওরা চুপ করে গেছল।

লজ্জায় আর ভয়ে খাটের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে কোনি শুয়েছিল। থেকে থেকে চাপা একটা অভিমান গুমরে উঠছিল বুকের মধ্যে। ক্ষিদ্দা তাহলে সত্যি সত্যিই খড়্গপুর থেকে কলকাতায় ফিরে গেল! যদি এখানে সঙ্গে আসত তাহলে কষ্ট অনেক কমে যেত। অনেকের সঙ্গেই তো বাবা-মা এসেছে। ক্ষিদ্দা তাহলে এল না কেন!

হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল হিয়া। ওর বাবা-মা হোটেলে রয়েছে। তারা সকালে এসে হিয়াকে নিয়ে বেরিয়েছিল। ঘরে কাউকে না দেখে হিয়া প্রথমে থমকে গেল। তারপর কোনিকে দেখতে পেয়ে বলল, ‘‘বাবার বন্ধু মিস্টার সারঙ্গপানির বাড়িতে আমি যাচ্ছি, প্রণতিদিকে বলে দিও। ঘণ্টা দুই পরে ফিরব।”

ঘরের আর একদিকে হিয়ার খাট। সেখানে তার বিরাট স্যুটকেশে অজস্র রকমের জিনিস। ইংরাজি কমিকস্ আর ট্রানজিস্টর রেডিও বিছানায়, খাটের নীচে তিন রকমের জুতো আর চকোলেটের মোড়ক ছড়ানো। হিয়া চটপট ফ্রক বদল করে চুলে ব্রাশ বোলাল। হাত ব্যাগটার মধ্যে একটা চকোলেটের বার দেখতে পেয়ে আধখানা মুখে ঢুকিয়ে বাকিটুকু ভেঙে কোনির দিকে ছুঁড়ে দিল।

টুকরোটা এসে পড়ল কোনির বুকের কাছে। সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল হিয়ার দিকে। হিয়ার গায়ে লাগল।

একটু অবাক হয়ে হিয়া প্রশ্ন করল, ‘‘খাও না তুমি?’’

‘‘দিলেই খেতে হবে নাকি!’’ কোনি শুকনো স্বরে বলল।

চকোলেট টুকরোটা কুড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হিয়া বলল, ‘‘বুঝেছি কেন খাবে না।’’

‘‘কী বুঝেছ?’’ স্প্রিংয়ের মতো কোনি ছিটকে উঠে বসল।

‘‘যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি। তুমি কমপ্লেক্সে ভুগছ, অযথা আমার ওপর রেগে আছ।’’

হিয়া কথা বলতে বলতে বেলার টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। ক্রিমের কৌটোটা খুলে আঙুল ডুবিয়ে খানিকটা ক্রিম তুলে গালে লাগাল। ‘‘বাবা বলেছিলেন, রমা যোশি গতবারের মতো ছটা গোল্ড এবার পাবে না যদি স্টেট মিটে যেভাবে হানড্রেড ফিনিশ করেছিল সেইভাবে তুমি কাটতে পারো। কিন্তু আমি বলছি তুমি তা পারবে না।’’

হিয়া আর একটু ক্রিম তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে থমকে গেল। কোনির কাছে এসে, ওর মুখে সেটুকু লাগিয়ে দিয়েই হেসে উঠল সে এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, ‘‘অত হিংসে ভালো নয়।’’

কোনিকে বিভ্রান্ত করল হিয়ার এই কথাটা। আপন মনে সে বলল, ‘বয়ে গেছে আমার হিংসে করতে। বড়োলোক্‌মি দেখিয়ে চকলেট দেওয়া... কে চায় তোর ভিক্ষে, নিজের জিনিস অন্যকে দিতে হিয়া কার্পণ্য করে না, পরের জিনিস নেওয়াতেও কুণ্ঠা নেই। মুখে ক্রিমটুকু অন্যমনস্কের মতো বুলিয়ে নিয়ে কোনি আবার বলল, ‘এসব হচ্ছে বড়োলোকি চাল। লোককে দেখানো আপন-পর জ্ঞান আমার নেই, বুঝি না যেন কিছু!’

ঘরে ঢুকল হরিচরণ।

‘‘অঃ তুই একা রয়েছিস, ওরা গেল কোথায়? কী ঝামেলা দ্যাখ্‌তো, তোর নাম চারটে ইভেন্টে পাঠান হয়েছিল, অথচ কোনোটাতেই নাম দেখছি না। নিশ্চয় গোলমাল হয়েছে কোথাও। খোঁজ নিয়ে দেখব’খন। অমিয়া ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস তো।’’

যেমন বেগে এসেছিল তেমনিভাবেই হরিচরণ বেরিয়ে গেল। আর থ হয়ে রইল কোনি। এতদূরে এসে চ্যামপিয়নশিপে সে নামতে পারবে না। আর কিছু সে ভাবতে পারল না। আস্তে আস্তে একটা কান্না তার সারা শরীরটাকে ঝাঁকাতে শুরু করল। ফাঁকা, বিরাট ঘরটা একটু একটু করে ভরে উঠতে লাগল মৃদু চাপা করুণ একটা স্বরে। আর তার মধ্যে একটা শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে — ‘‘ক্ষিদ্দা, ক্ষিদ্দা।’’

মেয়েরা ফিরল তর্ক করতে করতে। এবারের ওলিম্পিককে মেক্সিকো না মেক্সিকো সিটি ওলিম্পিক, কোনটা বলা সঠিক হবে। ওরা লক্ষই করল না কোনিকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে সবাই সচকিত হয়ে বেলার দিকে তাকাল। হাতে খোলা ক্রিমের কৌটা, বেলা ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠল, ‘‘আমার ক্রিম! আবার কে নিয়েছে এখান থেকে। কে নিয়েছে? আমি আজ বার করবই, বেরিয়ে যাবার সময় যা ছিল, এখন তার থেকে অনেক কমে গেছে।’’

কে একজন বলল, ‘‘ঘরে তো কোনি ছাড়া আর কেউ ছিল না।’’

অমিয়া হঠাৎ বলল, ‘‘দ্যাখ্ তো কোনির ব্যাগটা, সরিয়ে-ফরিয়ে রেখেছে কিনা।’’

বেলা ছুটে গিয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা খুলে উপুড় করল। সামান্য জিনিস ক’টা মেঝেয় পড়ল। কোনি বিস্ফারিত চোখে

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে। কথা বলার ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছে, এই ঘটনার আকস্মিকতায়। বেলা পা দিয়ে কোনির কস্ট্যুমটা সরাতেই, ‘‘আহ্’’ বলে সে নিচু হলো কস্ট্যুমটা তোলার জন্য। বেলা সেই মুহূর্তে ওর চুল মুঠোয় টেনে মুখ উঁচু করে ধরল।

‘‘কী মেখেছিস? অ্যাঁ, কী মাখা রয়েছে তোর মুখে?’’ আবিষ্কারের উত্তেজনায় বেলার দম বন্ধ হয়ে এল।

মেয়েরা এগিয়ে এল কোনিকে ঘিরে। অমিয়া একটা আঙুল দিয়ে কোনির গাল ঘষে, আঙুলটা নাকের কাছে ধরে বিচারকের মতো গম্ভীর স্বরে রায় দিল, ‘‘ক্রিম।’’

‘‘আমার ক্রিম।’’ বেলা চিৎকার করে উঠল।

তারপর ওরা সদ্য আবিষ্কৃত একটি দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকা নাবিকদের মতো কোনিকে দেখতে পেল। কোনি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে। মুখের বিস্ময়ভাব কাটেনি তখনো, অসহায় চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে, কিছু বলার জন্য তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু বলতে পারছে না।

‘‘কোনি বোধহয় ফরসা হতে চায়।’’ একজন মন্তব্য করল।

‘‘বাব্বা, আমি যা ভয়ে ছিলুম, বেলাদি বোধহয় আমাকেই চোর সন্দেহ করছে।’’

‘‘আমারও পেস্টও তাহলে কে কমিয়েছে এবার বোঝা গেল।’’

কোনি এতক্ষণে কথা বলল, ‘‘হিয়া ক্রিম বার করে আমার মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। আমি কখনো ক্রিম মাখি না।’’

‘‘কী বললি? হিয়া?’’ বেলা ঠাস করে কোনিকে চড় মারল। ‘‘হিয়ার নামে অপবাদ দিচ্ছিস? জানিস ও কতো বড়োলোক! তোর মতো দশটা মেয়েকে ও ঝি রাখতে পারে। শেষকালে কিনা হিয়াকেই চোর বানাচ্ছিস!’’

‘‘সত্যি বলছি বেলাদি। আমায় বিশ্বাস করো। হিয়া এসেছিল, আবার বেরিয়ে গেল ওর বাবার বন্ধুর বাড়িতে। চকলেটের আধখানা আমায় দিল আর তোমার ক্রিমের কৌটো থেকে ক্রিম নিয়ে নিজে মাখল আর আমাকেও মাখিয়ে দিল।’’

‘‘গপ্পো লেখ কোনি, তুই মস্তো লেখক হবি।’’ বেলার ধীরস্বরে বিদ্রূপ চাবকে উঠল।

‘‘তাহলে তো একটা দ্বিতীয় ভাগ আগে কিনে দিতে হবে।’’ অমিয়া তার খাটে শুয়ে মিটিমিটি হেসে বলল।

‘‘আমি সত্যি বলছি।’’ কোনির স্বর দুমড়ে মুচড়ে গেল কান্নায়। ‘‘তোমরা বিশ্বাস করো। হিয়া এলে ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।’’

ওরা আর বেশি কথা বলল না। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, ফিসফাস করল কিছুক্ষণ। কোনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঠের মতো বসে। প্রণতি ভাদুড়ি আর ধীরেন ঘোষ ঘরে ঢুকল। ওরা যেভাবে কোনির দিকে তাকাল তাতে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা ওদের কানেও ইতিমধ্যে কেউ পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

‘‘হিয়া না আসা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।’’ প্রণতি ভাদুড়ি ঘরের সবাইকে লক্ষ করে বলল। ‘‘যাও, খেয়ে রেস্ট নাও।’’

‘‘অমিয়া, কাল সকালে তোর ফোর আর টু হানড্রেড হিট। যোশি ছাড়া আর কেউ তোর কম্পিটিটার নেই। তা হলেও হিটে টাইম ভালো করতে হবে। বেলা শুনে রাখ, যোশি পড়েছে তোর গ্রুপে। চেষ্টা করবি, পাঞ্জাবের কাউর বলে একটা মেয়ে শুনলাম ভালো টাইম করে এসেছে।’’

ধীরেন ঘোষ প্রত্যেককে নির্দেশ দিতে দিতে শেষকালে কোনির দিকে তাকাল। ‘‘তোর নাম যে কেন বাদ গেল বুঝছি না। বলছে তো পাঠানোই নাকি হয়নি। সব বাজে কথা, নিজেদের দোষ ঢাকতে এখন এইসব বলছে। আমি অবশ্য প্রোটেস্ট করেছি, দেখি কী হয়। তবে প্র্যাকটিস ঢিলে দিলে চলবে না, ওটা রেগুলার করতেই হবে। মন খারাপ করিসনি, ন্যাশনাল তো বছর বছরই হয়, সামনের বছর আবার আসবি।’’

মেয়েরা খাওয়া সেরে এসে বিছানায় শুয়েছে, এমন সময় হিয়া ফিরল। কোনি না খেয়েই শুয়েছিল, হিয়াকে দেখা মাত্র উঠে বসে চেঁচিয়ে বলল, ‘‘এই তো হিয়া এসেছে।’’

বেলা হাত ধরে হিয়াকে নিজের বিছানায় বসিয়ে বলল, ‘‘আজ একটা ব্যাপার ঘটেছে। কোনি তোমাকে চোর বলেছে।’’

‘‘হোয়াট!’’ ঝটকা দিয়ে হিয়া উঠে দাঁড়াল দু’চোখে আগুন নিয়ে।

‘‘বোসো বোসো, আগে আমার কথাটা শুনে নাও।’’ বেলা হাত ধরে টেনে হিয়াকে বসাল আবার।

‘‘আমি জানি আমার প্রতি ও জেলাস। কিন্তু এমন নোংরা অপবাদ দেবে ভাবিনি।’’

‘‘আমরাও ভেবেছি নাকি! ক্রিম চুরি করে মুখে মেখে ধরা পড়ে গিয়ে বলেছে তুমি নাকি মাখিয়ে দিয়েছ। এমন বোকার মতো মিথ্যে কথা কেউ বলে!’’

হিয়া থতমত খেয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগটা মাথা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে যে ধাক্কাটা দিচ্ছে তা সামলে উঠে সে বলল, ‘‘ক্রিম তো আমিই ওর মুখে লাগিয়ে দিয়েছি।’’

‘‘য়্যা!’’

‘‘হ্যাঁ তোমার কৌটোটা থেকে আমি মাখলাম, কোনির মুখেও লাগিয়ে দিলাম। কী করব বলো, তোমার পারমিশন নেবার সময় তখন ছিল না। কালও মেখেছিলাম।’’

হিয়া ব্যাপারটা সেখানেই শেষ করে দিয়ে, পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলো। সারা ঘর চুপ। আড়চোখে পরস্পরকে দেখে নিয়ে অনেকেই ঘুমের ভান করল। কোনি একদৃষ্টে হিয়ার দিকে তাকিয়ে। মনে মনে সে বলল, ‘তোমার খেয়ালখুশির জন্য আজ আমি চড় খেয়েছি, খারাপ কথা শুনেছি।’

বেলা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেছল। এখন তার রাগটা পড়ল হিয়ার উপর। বিরক্ত স্বরে সে বলল, ‘‘পরের জিনিস না বলে ব্যবহারটা খুব অন্যায়। তোমার নয় অনেক টাকা আছে, আমার ওই একটুখানি ক্রিম থেকে যদি সবাই মাখে...’’

‘‘আচ্ছা আচ্ছা, নয় তোমায় একটা কিনে দেবো, হয়েছে তো।’’ হিয়া হেসে অপরাধীর মতো মুখ করে হাত জোড় করল। ঠিক সেই সময়ই কোনি ছুটে এসে ওকে চড় মারল।

হিয়া গালে হাত দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। বিছানায় মুহূর্তে সবাই উঠে বসেছে। কোনি ধীর পায়ে নিজের খাটে ফিরে এসে বসল।

‘‘এটা তোমার পাওনা ছিল। বেলাদিকে জিজ্ঞাসা করো, জানতে পারবে। তোমার জন্যই আমি আজ চড় খেয়েছি, চোর বদনাম পেয়েছি।’’ কোনি একটু থেমে আবার বলল, ‘‘তোমাকে আমি একটুও হিংসা করি না। আমি বস্তির মেয়ে, লেখাপড়াও জানি না, তোমার সঙ্গে পারব কেন। তবে একবার কখনো যদি জলে পাই ...’’ দাঁতে দাঁত চেপে বাকি কথাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ায় কিছু শোনা গেল না।

চিপকে সমুদ্রতীরে সুইমিং পুল।

কোনি আগে কখনো এমন পুল দেখেনি। যন্ত্রের সাহায্যে অবিরাম পরিশোধিত স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়ে পুলের তলদেশ দেখা যায়। একটা পিন পড়ে থাকলেও নজরে আসে। কোনি শুনেছে কলকাতায় সাহেবদের ক্লাবে এমন পুল আছে।

তিনদিকে কাজুবাদাম গাছের ডাল দিয়ে তৈরি হয়েছে গ্যালারি, মাথায় নারকেল পাতার ছাউনি। পাশেই ডাইভিং পুল। পুলের জলে প্রথম নেমে কোনি অস্বস্তি বোধ করেছিল। জলের সঙ্গে পরিচয়ের অনুভব পেতে অবশ্য তার বেশি সময় লাগেনি। হাতে স্টপ ওয়াচ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে নেই অথচ সে সাঁতার কাটছে, কোনি গত একবছর আর তা ভাবতে পারে না। কিন্তু মাদ্রাজে সে জলে নামার আগে পিঠে পরিচিত একটা হাতের স্পর্শ অভ্যাস মতো না পেয়ে মুষড়ে পড়ল। কী ট্রেনিং সে করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। কেউ কিছু বলছে না, দেখিয়েও দিচ্ছে না। হিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত প্রণবেন্দু। হরিচরণের অধিকাংশ নির্দেশ অমিয়ার জন্য। তবু কোনি মোটামুটি জোরে ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, কয়েকটা ২৫ মিটার স্প্রিন্ট, আবার ৪০০ মিটার, মিনিট পাঁচেক টার্ন ও স্টার্ট, তারপর ২০০ মিটার মেডলি কাটল।

স্টার্টিং ব্লকে বসে কস্ট্যুম পরা একটি মেয়ে ওদের ট্রেনিং দেখছিল। কোনি জল থেকে উঠে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটি হাসল।

"হোয়াটস ইওর নেম?"

"মাই নেম ইজ কনকচাঁপা পাল।"

"ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল স্টাইল।"

কোনি এবার ফাঁপরে পড়ল। ইংরাজিতে জবাব দেওয়ার দায় এড়াবার জন্য সে শুধু হাসল। মেয়েটি আঙুল তুলে হিয়াকে দেখিয়ে বলল, "ইজ শি এ ফ্রি স্টাইলার?"

"কেয়া বোল্‌তা?"

"উও ফ্রি স্টাইলার হ্যায়?"

"হাম হ্যায়। ও হ্যায় ব্রেস্ট স্ট্রোক্‌কা, মেডলিকা। তোমার স্ট্রোক কেয়া?"

মেয়েটি হেসে বলল, "রমা যোশি।"

কোনি এবার ভালো করে তাকাল। শ্যামলা মাজা রং, দোহারা গড়ন। চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতোই দেখতে। হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল '৭০' সংখ্যাটা। কোনি দ্রুত ড্রেসিং রুমের দিকে পা চালাল।

বাংলাকে প্রথম গোল্ড এনে দিল হিয়া। পাঁচটির বেশি মেয়ে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতার কাটার জন্য, তাই হিট করার দরকার হয়নি। হিয়া ৩মি ৩২সে সময় নিল।

প্রতিযোগীদের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারিতে বসেছিল কোনি। দেখল ভিকট্রি স্ট্যান্ডে হিয়া উঠল আরো দুটি মেয়ের সঙ্গে। ওর গলায় মাদ্রাজের এক মন্ত্রী মেডেল ঝুলিয়ে দিল। ব্যান্ড বাজল। আর তার বুকের মধ্যে অসহ্য একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। পুলের ওধারে বসেছে হিয়ার বাবা-মা। ছুটে গেল হিয়া। বাবা জড়িয়ে ধরে চুমু দিল। হিয়াকে কোলে টেনে নিল মা। হিয়া তোয়ালের ক্লোকটা গায়ে দিয়ে ওধারে এল।

''দেখি দেখি মেডেলটা।''

হিয়াকে ঘিরে ধরল মেয়েরা।

''কনগ্র্যাটস হিয়া।''

''থ্যাঙ্কয়ু।''

''দারুণ ফিনিশ করেছে। আমি তো ভাবলুম গুজরাট যেরকম নেক অ্যান্ড নেক যাচ্ছে, টারনিংয়ে যদি হিয়া ওকে না মারতে পারে তাহলে বোধহয় — ''

''আমার শুধু ওই একবারই তখন ভয় হয়েছিল। টারনিংটা আমার এত খারাপ।''

''মাইশোরের মেয়েটাকে দেখেছিস কেমন যেন আগাগোড়াই মুখ তুলে রইল।''

কোনি তফাতেই বসে রইল। হিয়া বারকয়েক গ্যালারিতে চোখ বোলাবার সময় কোনির মুখের দিকে তাকিয়েছিল মাত্র। মেয়েদের একটিই ফাইনাল ছিল, বাকিগুলি ফ্রি স্টাইলের হিট। অমিয়া ফ্রি স্টাইলের তিনটিতেই ফাইনালে উঠেছে, বেলা ২০০ মিটারে এবং হিয়া ১০০ মিটারে। কথা ছিল হিয়া ২০০ ও ৪০০ মিটারেও নামবে কিন্তু প্রণবেন্দু শেষ মুহূর্তে ওর নাম প্রত্যাহার করিয়ে নেয় এই যুক্তিতে যে ওর অন্য ইভেন্টগুলো, যাতে ওর গোল্ড পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে, সেগুলোর ক্ষতি হবে।

তর্ক তুলেছিল হরিচরণ, ''কী এমন ক্ষতি হবে? দুটো ব্রোঞ্জ তো শ্যিওর আসতো, তার মানে বেঙ্গলের দুটো পয়েন্ট। এবার চ্যামপিয়নশিপের জন্য বেঙ্গলের খুব ভালো চান্স রয়েছে। প্রণবেন্দু, তুমি শুধু হিয়ার কথাই ভাবছ, বেঙ্গলের কথাটা ভাবছ না।''

শোনা মাত্র প্রণবেন্দু দপ্ করে উঠেছিল। ''বেঙ্গলের কথা আমি ভাবি না, শুধু আপনারাই ভাবেন! তাহলে মেয়েটা ওখানে বসে আছে কেন?'' প্রণবেন্দু আঙুলটা গ্যালারিতে বসা কোনির দিকে তুলে বলল, ''ও থাকলে বেঙ্গল শ্যিওর চ্যামপিয়নশিপ পেত, কিন্তু আপনারা ক্ষিতীশ সিঙ্গিকে জব্দ করার জন্য ওকে ভিক্টিমাইজ করলেন। আর এখন এসে বাংলার জন্য কাঁদুনি গাইছেন? এবার আমি দেখব আপনার মেয়েরা কী করে, কত পয়েন্ট আনে!''

কোনি জানত না তাকে কেন্দ্র করে দুটো দল পাকিয়ে উঠে ঝগড়া শুরু করেছে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ফাইনাল বিকালে ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইয়ের। অমিয়া আর বেলা পুল থেকে ফিরে এসেই বিছানায়। ধীরেন ঘোষ বিস্কুট আর কমলা লেবু এক হাতে, অন্য হাতে মধু ভর্তি শিশি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

''কাল সকালের জন্য। দুধ দুজনের জন্য দু' গ্লাস রেডি করে রাখো প্রণতি। ঠিক আটটায় পুলে পৌঁছনো চাই। এখন একদম রেস্ট, সাতটার মধ্যে খেয়ে নিয়েই ঘুম।''

যথাসাধ্য নির্দেশ দিয়ে ধীরেন ঘোষ ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল।

''তোমাদের একটা কথাই বলব, প্রথম গোল্ড বাংলা আজ এনেছে। শুভ জয় যাত্রায় আমরা বেরিয়েছি, শেষ গোল্ডও আমাদের, আমরা চ্যামপিয়ন হবেই। মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বাঙালি তোমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারা অধীরভাবে অপেক্ষা করছে বাংলার মেয়েরা চ্যামপিয়নশিপ নিয়ে ফিরবে... ফিরবেই। একটা গোল্ড পেয়েছি, বাকি আটটাও আমরা নোব। আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না।''

পরদিন দুটি ইভেন্টের দুটিতেই প্রথম হলো রমা যোশি। ২০০ মিটারে অমিয়া ব্রোঞ্জ পেল। রূপো নিল মহারাষ্ট্রেরই নতুন মেয়ে সাধনা দেশপান্ডে। বেলা পঞ্চম স্থান পেল। চিৎকারের গোল্ড মেডেল থাকলে সেটা পেত হরিচরণ। অমিয়া যথাসাধ্য করেছে। কিন্তু গত বছরের থেকে তার সময় ৬ সেকেন্ড কম হলো।

গম্ভীর মুখে অমিয়া জল থেকে উঠে গেল। বেলা ফুঁপিয়ে উঠল কয়েকবার। হিয়া এগিয়ে এসে যোশিকে অভিনন্দন জানাল। এরপর ঘোষণা, ভিকট্রি স্ট্যান্ডে গলায় মেডেল পরা, ব্যান্ডের বাজনা। কোনি উদাস চোখে সব কিছু দেখল মাত্র।

বিকেলে মেয়েরা দল বেঁধে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেল। কোনি পুলেই রয়ে গেল। বাটারফ্লাইয়ে রমার ধারে-কাছে কেউ আসতে পারল না। বাংলার কোনো মেয়ে ফাইনালে নেই। দিল্লি আর গুজরাট বাকি মেডেল দুটি নিল। কোনি নিরুৎসক চোখে সব কিছু দেখল।

শুক্রবার সকালে সোনা জিতল হিয়া আর রুপো পুষ্পিতা ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে। ব্রোঞ্জ গুজরাটের। চ্যামপিয়নশিপের মাঝপথে বাংলার ১৪ ও মহারাষ্ট্রের ১৬ পয়েন্ট, হিয়া ও রমার দুটি করে সোনা। চাপা একটা উত্তেজনা বাংলার ক্যামপে মৃদু কম্পন তুলল। কোনি কোনো কথায় যোগ দিল না।

দুপুরে খেতে বসার আগে ধীরেন ঘোষ এসে বলে গেল, ‘‘বাংলা আবার ভারতের সাঁতারে নিজের জায়গায়” — ডান হাতের তর্জনী মাথার উপর তুলে গলা কাঁপিয়ে বলল, ‘‘উঠেছে।”

হিয়ার ট্রানজিস্টরে রক মিউজিক বাজছিল। প্রণতি ভাদুড়ি রেডিওটা বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে ধমক দিল, ‘‘শোনো শোনো। ইনসপিরেশন পাবে তা হলে।”

‘‘কিপ আপ দি ফ্ল্যাগ, এখন সমান চলেছে কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাবই।”

রমা যোশি বিকেলে অমিয়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ১৫০ মিটারে টার্ন নিয়েই এবং অমিয়া যখন শেষবার টার্ন নিচ্ছে তখন সে ৪০০ মিটার শেষ করল। যেন ১০০ মিটারে প্রতিযোগিতা করছে এমন বেহিসাবিভাবে অমিয়া শুরু করে ছিল। সওয়াশো মিটার পর্যন্ত রমা পিছিয়ে ছিল প্রায় ১০ মিটার। তারপরই অমিয়া মন্থর হতে শুরু করে। রমা তার সমান গতিতে কোনো হেরফের না ঘটিয়ে তিনশো মিটারের পর গতি বাড়াল এবং শেষ ৫০ মিটার একা সাঁতরে এল। পাঞ্জাবের মঞ্জিত কাউর ব্রোঞ্জ নিল।

অমিয়া সকলের আগেই ট্যাক্সি করে একা ক্যামপে ফিরে আসে। শনিবার সকালে হিয়ার দুটি হিট, মেডলি এবং ব্যাক স্ট্রোকের। সব মেয়ের চোখ এখন হিয়ার দিকে। গম্ভীর হয়ে গেছে সে। ধীরেন ঘোষ আজ আর বক্তৃতা দিল না। মাথা নেড়ে বলল, ‘‘অমিয়ার মতো ভেটারেনের কাছ থেকে এমন ব্যাডলি জাজ্‌ড্ রেস কেউ আশা করেনি। আমরা চার পয়েন্টে পিছিয়ে পড়লুম।”

‘‘হরিচরণদা যদি অমিয়াদিকে একটু বলেও দিত!” বেলা ক্ষীণস্বরে বলল।

‘‘যাকগে যা হবার হয়েছে। এখন অনেক কিছু হিয়ার উপর নির্ভর করছে। কাল সকালে দুটো হিট, রাতে মেডলির ফাইনাল। তোমরা ওকে কনসেনট্রেট করতে দাও।”

ধীরেন ঘোষ চলে যাবার পর সবাই হিয়ার দিকে তাকাল, একমাত্র কোনি ছাড়া।

হিয়া শনিবার সকালের দুটো হিট থেকে অনায়াসেই ফাইনালে উঠল। ব্যাক স্ট্রোকে রমা যোশি নেই। কিন্তু মেডলির দ্বিতীয় হিট থেকে রমা ফাইনালে উঠল হিয়ার সময়কে দুই সেকেন্ড ম্লান করে। ঘোষণায় রমার সময় শোনা মাত্র হিয়া পুল ছেড়ে চলে গেল বাবা-মার সঙ্গে।

মেয়েরা ফিসফাস কথা বলছে। খাটে উপুড় হয়ে রেডিওয় হিন্দি গান শুনছে হিয়া। গত চারদিন কোনির সঙ্গে কারুর বাক্যালাপই হয়নি। অমিয়া কখনো বিছানায় শুচ্ছে, উঠে এসে জানলায় দাঁড়াচ্ছে, টেবলের এটা ওটা নাড়ছে। প্রণতি ভাদুড়ি তার খাটে শুয়ে কমিকস্ পড়ছে।

''অমিয়াদি শুয়ে পড়ো।"

অমিয়া বিরক্তমুখে বেলার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। ''ভীষণ মাথা ধরেছে। তখন থেকে রেডিওটা জ্বালাচ্ছে। হিয়া, ওটা বন্ধ করো।"

হিয়া রেডিও বন্ধ করার উদ্যোগ দেখাল না।

''বলছি, রেডিও বন্ধ করো।"

হিয়া একটু জোর করে দিল রেডিওর শব্দ। অমিয়া চিৎকার করে উঠল, ''বন্ধ করবে কি করবে না, আমার ভালো লাগছে না।"

''রেডিও শুনতে আমার ভালো লাগছে। হিয়া শুকনো গলায় বলল, ''আপনি চেঁচাবেন না।"

কী ঔদ্ধত! অমিয়া অবাক হয়ে ঘরের সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউই তার দিকে তাকিয়ে নেই, এমনকি বেলাও গভীর মনোযোগে রহস্য কাহিনি পাঠে ব্যস্ত। এতদিন বাংলার মেয়ে সাঁতারু মহলে সে সম্রাজ্ঞীর মতো বিরাজ করেছে। এই মুহূর্তে সে বুঝল তার মাথা থেকে মুকুট তুলে নিয়েছে হিয়া। এবার ওকে মধ্যমণি করেই ওরা ঘুরবে ওদের প্রশংসা, মনোযোগ এবার থেকে পাবে হিয়া। তার দিন ফুরিয়ে গেছে। বিছানায় এসে বসল অমিয়া। দিন কি সত্যিই ফুরিয়ে গেছে! কাল আসছে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ৪×১০০ রিলে। দেখা যাক সত্যিই ফুরিয়ে গেছে কিনা, অমিয়া ভাবল, কাল আমাকে দেখাতেই হবে।

কিছু পরে প্রণতি ভাদুড়ি উঠে এসে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। হিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যায় পুলের হাজার হাজার ওয়াটের আলোয় স্টার্টিং ব্লকের উপর হিয়ার লাল কস্ট্যুম একটি স্থির শিখার মতো অপেক্ষা করছে। তার পাশে রমা যোশি তার পাশে গুজরাটের আমি পটেল। স্টার্টারের বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে জ্বলে উঠল হিয়া।

বাটারফ্লাইয়ে রমার তুল্য ভারতে কেউ নেই। প্রায় দশ মিটারে সে হিয়াকে পিছনে ফেলে গেল শুশুকের মতো ঢেউ খেলানো গতিতে। বোর্ড ছুঁয়েই ব্যাক স্ট্রোক। হঠাৎ গ্যালারি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। হিয়া এবার ব্যবধান কমাচ্ছে।

গ্যালারি তোলপাড় হতে শুরু করল পুলের জলের মতোই। ব্যাক স্ট্রোকের শেষে রমা তখনো প্রায় চার মিটার এগিয়ে। এবার ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং হিয়া জানে এইবারই তাকে বড়ো ব্যবধান তৈরি করতে হবে। এরপরই ফ্রি স্টাইল এবং রমার সঙ্গে এখানে সে পারবে না।

প্রচণ্ডভাবে হিয়ার দুটো হাতের সঙ্গে তাল দিয়ে পা দুটো জলে ধাক্কা দিতে শুরু করল। রমার সঙ্গে পাশাপাশি এসে গেল পুলের মাঝামাঝি এবং এই প্রথম সে রমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। পাশে মুখ ফিরিয়ে হিয়াকে দেখতে দেখতে রমাও জোর বাড়াল।

গ্যালারিতে প্রলাপ চিৎকার শুরু হয়েছে। বাংলার মেয়েরা একসঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে যাচ্ছে 'হিয়া, হিয়া'। শুধু অমিয়া ক্লান্ত ভঙ্গিতে অনুত্তেজিত বসে কোনির পাশে, মুখে পাতলা একটা হাসি নিয়ে। আপন মনেই সে বলল, ''হিয়া জিতবে।"

এবং হিয়া জিতল।

ফ্রি স্টাইল শুরু করেছিল হিয়া চার মিটার এগিয়ে থেকে। সেই ব্যবধান থেকে রমা অর্ধেকটা কেড়ে নিল সাঁতার শেষের তিরিশ মিটার বাকি থাকতেই। এবার শুরু হয় দুজনের মধ্যে বাঁচা-মরার লড়াই। ইনচি-ইনচি করে রমা এগিয়ে আসতে থাকে। ফিনিশিং বোর্ডে টাইম কিপাররা ঘড়ি হাতে ঝুঁকে অপেক্ষা করছে। গ্যালারিতে লোকেরা সরে আসছে ফিনিশ দেখার জন্য।

হিয়ার হাত বোর্ড ছোঁয়ার আধ সেকেন্ডের মধ্যেই রমার হাত পৌঁছল।

“বলেছিলুম।” অমিয়া আবার আপন মনে বলল।

কে জিতেছে জানার জন্য ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো এবং মেয়েরা যখন হিয়াকে জড়িয়ে ধরে নিজেদের চোখের জল তার গালে মাখিয়ে দিচ্ছিল, তখন একমাত্র কোনিই দেখতে পেল, অমিয়ার চোখের কোণে জল।

বাংলা এখনো দু’ পয়েন্টে পিছিয়ে। হিয়া ও রমার সোনা তিনটি করে। ধীরেন ঘোষ উত্তেজিত হয়ে রাত্রে খাবার আগে মেয়েদের বলে গেল, “কাল সকালে আর একটা গোল্ড পাচ্ছে হিয়া! বেঙ্গল এগিয়ে যাবে।”

“ধীরেনদা, ভুলে যাবেন না, তারপরও দুটো ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট আছে।” অমিয়া ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে আনমনে বলল, “রমা যোশি ইন্ডিয়া রেকর্ড হোল্ড করছে।”

রবিবার সকালে অমিয়া পুলে গেল না। মেয়েরা চিৎকার করতে করতে যখন ঘরে ঢুকল, সে তখন একমনে চিঠি লিখছিল। মুখ না তুলেই বলল, “হিয়ার তাহলে চারটে গোল্ড হলো।”

“অমিয়াদি, দারুণ ব্যাপার, অঞ্জু একটুর জন্য ব্রোঞ্জ মিস করল।”

“অমিয়াদি, যোশিকে বিট করতে পারবে না?”

“অমিয়াদি, সবাই বলছে এখন তোমার ওপরই চ্যামপিয়নশিপ নির্ভর করছে। বাংলা-মহারাষ্ট্র এখন সমান পয়েন্ট।”

কোনির চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। সে তখন একটা সেফটিপিন দিয়ে সেটাকে ব্যবহারযোগ্য করার চেষ্টায় ব্যস্ত। এইসব উত্তেজনা তাকে স্পর্শ করছে না।

অমিয়া লেখা বন্ধ করে বলল, “চেষ্টা করব।”

জাতীয় সাঁতারের আজ শেষ দিন। সন্ধ্যায় ছ’টি মাত্র অনুষ্ঠান। প্রথমটিই মেয়েদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ফাইনাল। আটজন প্রতিযোগীর মাঝের লেনগুলিতে রমা, অমিয়া, হিয়া। আজ গ্যালারি উপচে পড়ছে। কোনি খালি পায়ে বসে। সেফটিপিনে চটিটাকে চলার যোগ্য করা যায়নি।

অমিয়া বন্দুকের শব্দের আগেই জলে পড়ল। দ্বিতীয়বার ফলস-স্টার্ট নিল মহারাষ্ট্রের সাধনা দেশপান্ডে এবং হিয়া। এরপর একসঙ্গেই আটজন জলে পড়ল বন্দুকের শব্দে। তিরিশ মিটারে দেখা গেল দুজন এগিয়েছে বাকিদের থেকে — রমা ও অমিয়া। তারপরই প্রচণ্ডভাবে নিজেকে বিস্ফোরিত করে অমিয়া পিছনে ফেলল রমাকে। টার্ন নিয়েই সে রমার থেকে এক মিটার এগিয়ে গেছে। রমার কিছুটা পিছনে হিয়া, তার পাশেই সাধনা। হরিচরণ চিৎকার করতে করতে কুঁজো হয়ে পড়েছে।

একটা অস্ফুট কাতরানি শোনা গেল। অমিয়া জলে ভাসছে আর ছটফট করছে পেট চেপে ধরে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত।

''ক্রাম্প, ক্রাম্প ধরেছে।''

জলে লাফিয়ে পড়ল দুজন। ছুটে গেল বাংলার অফিসিয়ালরা। হরিচরণ কপালে হাত দিয়ে বসল। রমা যোশি তখন ফিনিশিং বোর্ড ছুঁয়েছে। তার পিছনে হিয়া এবং সাধনা।

মহারাষ্ট্র তিন পয়েন্ট এগিয়েছে। শেষ ইভেন্ট ৪×১০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতে ১০ পয়েন্ট আনতে না পারলে বাংলার চ্যামপিয়ন হওয়া সম্ভব নয়। এখন হিয়া ও রমা, দুজনেই চারটি সোনা। পয়েন্টে দুজনেই সমান হয়ে ব্যক্তিগত যুগ্ম চ্যামপিয়ন হয়েছে। রিলের পয়েন্ট টিম পাবে কিন্তু ব্যক্তিগত সোনা পাওয়ায় কে এগিয়ে যাবে, সেটাও নির্ভর করছে এই ইভেন্টের উপর।

আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই চ্যামপিয়নশিপের শেষ অনুষ্ঠানের মেয়েদের ৪×১০০ রিলে শুরু হবে। ছেলেদের ফাইনাল এইমাত্র শেষ হলো।

অমিয়া মেডিক্যাল রুমের টেবলে শুয়ে। ঘরের বাইরে ধীরেন ঘোষ বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, ''এত কাছে এসে ভরাডুবি হলো। বাংলা তাহলে চ্যামপিয়নশিপটা পেল না। ভাগ্য, ভাগ্য!''

হরিচরণ থমথমে মুখে বলল, ''অমিয়া তো নামতে পারবে না, তাহলে রিলে টিমটা কী হবে? আর ক'মিনিট মাত্র সময় রয়েছে। হিয়া, পুষ্পিতা, বেলা ... ফোর্থ মেয়ে কে হবে?''

''রিজার্ভে আছে অঞ্জু আর — '' ধীরেন ঘোষ থেমে গেল। হরিচরণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে।

প্রণবেন্দু এবং আরো তিন-চারজন ব্যস্ত উত্তেজিত হয়ে হাজির হলো।

''একি, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে! রিলে টিমের কী হবে, আর যে সময় নেই।'' প্রণবেন্দু বলল।

''সেইটেই তো ভাবছি।''

''ভাবাভাবির কিছু নেই, কনকচাঁপা পালকে নামান, অমিয়ার জায়গায়।'' একজন রুক্ষস্বরে বলল।

''কিন্তু—''

''কিন্তু-ফিন্তু কিছু নেই ধীরেনদা। বেঙ্গলের এখনো একটা আউটসাইড চান্স আছে ওকে নামালে। অঞ্জু একদমই পারবে না।''

''আপনারা বসে বসে ভাবুন তাহলে, আমরাই ব্যবস্থা করছি।''

প্রণবেন্দু প্রায় ছুটেই চলে গেল। ধীরেন ঘোষ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আচমকা ঘুম ভাঙা মানুষের মতো অনুসরণ করল প্রণবেন্দুকে। হরিচরণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কোনি যথারীতি গ্যালারিতে বসে। বাংলার মেয়েরা শুকনো মুখে অনিশ্চিত স্বরে নিজেদের মধ্যে ফিশফিস করছে। পুরুষদের মেডলি রিলে ফাইনাল এবার শুরু হবে। প্রতিযোগীরা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে আসছে।

''কোনি, কোনি!''

হাত নেড়ে প্রণবেন্দু এবং আরো কয়েকজন ডাকছে। কোনি বুঝতে পারল না, তাকেই ওরা ডাকল কিনা।

''কোনি, তাড়াতাড়ি, কুইক।''

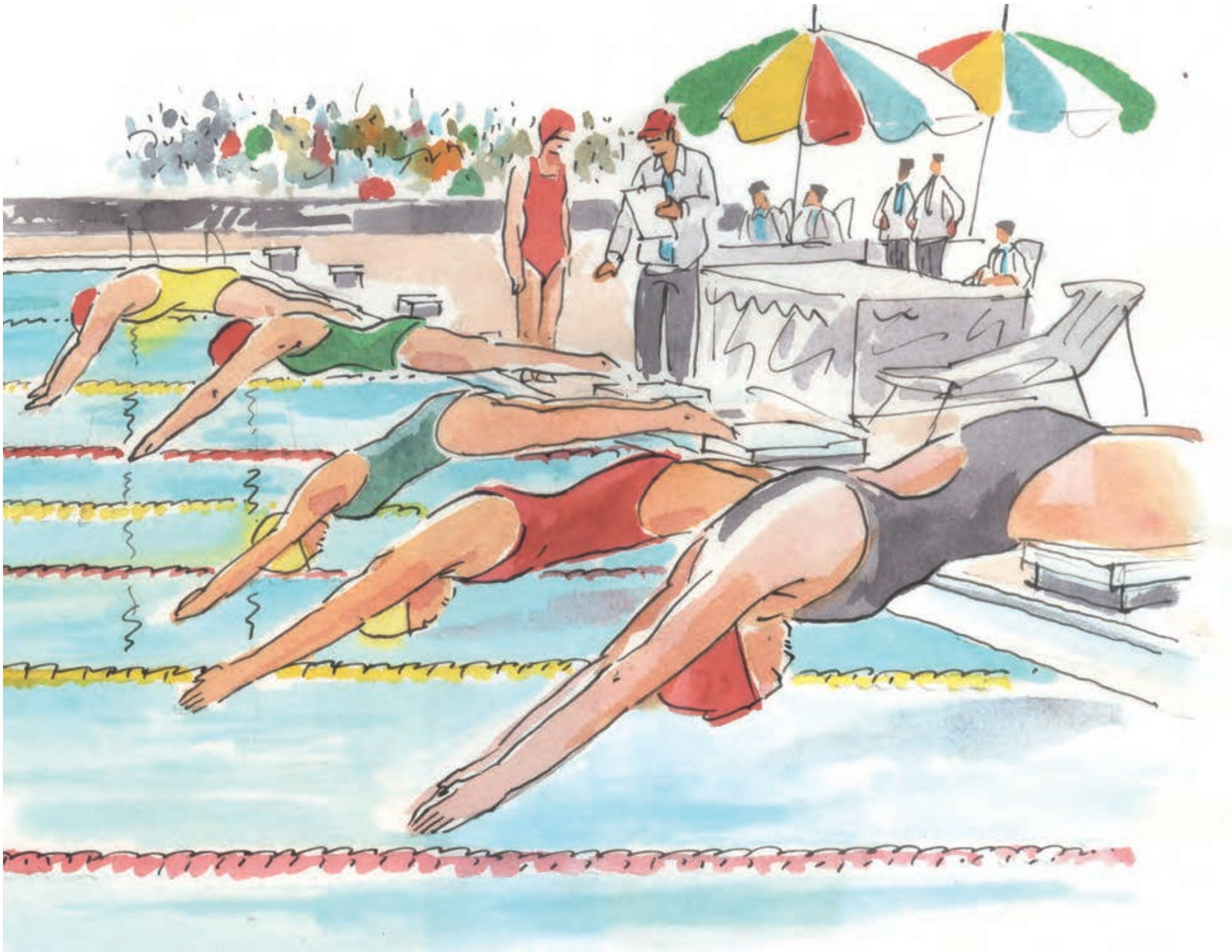

অবাক হয়ে কোনি তখনো বসে। ধীরেন ঘোষ হাত নাড়ছে তার দিকে। ‘‘কোনি, আর সময় নেই, তোমায় নামতে হবে রিলেতে অমিয়াদির জায়গায়।’’ হিয়া গ্যালারিতে উঠে এসে ওর হাত ধরল।

শিরশির করে উঠল কোনির শরীর।

‘‘আমি!’’

‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। কস্ট্যুম পরে নাও।’’

‘‘না, আমি নামব না।’’ কোনি হাত সরিয়ে নিল।

‘‘বেঙ্গল চ্যামপিয়ন হতে পারবে না।’’

‘‘না পারুক, আমি পারব না।’’

‘‘তুমি বেঙ্গলকে ভালোবাস না?’’

‘‘না, বাসি না।’’ কোনি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। বুকের থেকে উঠে আসা একদলা অভিমান ওর কণ্ঠে আটকে গেল। ‘‘ভালোবাসতে হয় তুমি বাসো। আমি গরিব, আমাকে দেখতে খারাপ, লেখাপড়া জানি না, কত কথা শুনলুম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। জোচ্চুরি করে আমাকে বসিয়ে রেখে এখন ঠেকায় পড়ে এসেছ আমার কাছে —’’

হিয়া ঝুঁকে কোনির দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দাঁত চেপে চাপাস্বরে বলল, ‘‘আমি নিজের জন্য আসিনি। বেঙ্গলের হয়েই তোমাকে ডাকতে এসেছি।’’

‘‘না। এসেছ নিজের জন্য। তুমি নিজের জন্য আর একটা গোল্ড চাও, রমা যোশিকে — ’’ কোনি থেমে গেল।

চড় মারার জন্য হিয়ার হাতটা উঠছে। কোনিও হাত তুলেছে। ছোরার মতো চারটে চোখের প্রচন্ড সঙ্ঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ল। ধীরস্বরে হিয়া বলল, ‘‘কোনি তুমি আনস্পোরটিং।’’

‘‘কী বললে?’’ ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো কোনি উঠে দাঁড়াল। ‘‘আমি কস্ট্যুম আনিনি।’’

‘‘আমার একস্ট্রা আছে।’’

অ্যামপ্লিফায়ারে ঘোষণা হচ্ছে, এবার শেষ অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। মেয়েদের টিম চ্যামপিয়নশিপ নির্ধারিত হবে এই রিলে সাঁতারেই। একে একে টিমের নাম পড়া হচ্ছে। পুলের প্রধান ফটকে এই সময় একটা হৈ চৈ উঠল। একটা পাগলা লোক তিরের মতো দৌড়ে পুলিশ ও ভলান্টিয়ারদের ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাকে তাড়া করেছে দু-তিনজন। প্রতিযোগীরা জলে নেমে শরীর ভিজিয়ে উঠে এসেছে। এখন তোয়ালেতে গা মোছায় ব্যস্ত। হিয়ার হাত থেকে তোয়ালটা টেনে নিল কোনি।

‘‘অন দা বোর্ড।’’ স্টার্টারের গলা শোনা যেতেই সারা পুলে ঝপ্ করে স্তব্ধতা নেমে এল। ব্লকের উপর উঠেছে মহারাষ্ট্রের সাধনা, পাঞ্জাবের মঞ্জিত, বাংলার হিয়া, এবং আরো দুটি মেয়ে। পাঁচটির বেশি টিম হয়নি।

‘‘গেট সেট...’’

নিখুঁতভাবে জলে পড়ল হিয়া ও সাধনা। পুলের গ্যালারিতে মর্মরধ্বনি ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠতে শুরু করল যখন হিয়া আগাগোড়া সাধনাকে পিছনে রেখে পুষ্পিতাকে তিন মিটার আগুয়ান থাকার সুবিধা দিল।

কিন্তু পুষ্পিতা এই সুবিধাটা ৫০ মিটারের বেশি ধরে রাখতে পারল না। মহারাষ্ট্রের লিন্ডা ডিসুজা তাকে অবহেলায় দুই লেংথে পিছনে ফেলল। ব্লকের উপর দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত বেলা দেখল তার পাশের লেনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহারাষ্ট্র।

ব্লকের পিছনে দাঁড়ানো হিয়া ফিসফিসিয়ে বলল, ‘‘বেলাদি অল আউট ... বেলাদি লড়ে যাও।’’

বেলা লড়ে গেল। সাধ্যের থেকেও নিজেকে বাড়িয়ে বেলা সাঁতার দিল। যেকোনো দিন, যেকোনো সময় দীপ্তি কারমারকার অন্তত চার লেংথে বেলাকে পিছনে ফেলবে। কিন্তু আজ বেলারই দিন। দীপ্তি দু’লেংথের ব্যবধানটা এক ইঞ্চিও বাড়াতে পারল না। বেলা যে এই ফারাকটা বজায় রাখতে পারবে, বাংলার কেউ আশা করেনি।

হিয়া হাতটা চেপে ধরেছে কোনির। একটা মোটর এঞ্জিন স্টার্ট নেবার চেষ্টায় থরথর করে উঠেই আবার থেমে যাচ্ছে। এমনভাবে কোনির শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। একদৃষ্টে সে জলে বেলার দিকে তাকিয়ে। স্টার্টিং ব্লকে ওঠার জন্য সে যখন পা তুলতে যাবে তখন —

‘‘কো ও ও ও নিইইই!’’

পা-টা নেমে এল

‘‘কো ও ও নিইইই!’’

তিন দিকের গ্যালারি সাঁতার থেকে একবার চোখ ফেরাল। পুলের পাশে দু-তিনটি ভলান্টিয়ারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে ময়লা পাঞ্জাবি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পুরু লেন্সের চশমা পরা একটি লোক।

"ফাইট, কোনি ফাইট।"

বক্সিংয়ের ভঙ্গিতে দুটো হাত চালাচ্ছে, "ফাইট, কোওওনিই।"

একটা আট সিলিন্ডার এঞ্জিনে হঠাৎ যেন স্পার্ক প্লাগ থেকে বিস্ফোরণের বার্তা পৌঁছেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল কোনি। চমকে হাতটা টেনে নিল হিয়া।

"ক্ষিদ্দা!"

হিয়া ঠেলে দিয়ে বলল, "কোনি ওঠো, কুইক্।"

ব্লকে উঠতে উঠতে কোনি বলল, "ক্ষিদ্দা এসেছে।"

রমা যোশি জলে পড়ল। তিন সেকেন্ড পর কোনি।

পুলে যদি জলের বদলে মাটি থাকত তাহলে বলা যেত একটা কালো প্যান্থার শিকার তাড়া করেছে। কোনির শিকার টাইম-কিপারদের হাতের ঘড়ি।

তিরিশ মিটার পর থেকেই দর্শকরা বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তারা নিশ্বাস ফেলার সময়টুকু দিতেও ভুলে গেল। গলার স্বর নেই। পলক পড়ছে না। গ্যালারির বহু লোক নেমে এসে পুলের ধারে দাঁড়িয়েছে। ভলান্টিয়াররাও।

জলকণায় তৈরি একটা আচ্ছাদনের ঘেরাটোপের মধ্যে কোনি যেন অশরীরী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। টার্নিংয়ের পরই দেখা গেল সে রমা যোশির পাশে। বিপদ এসে গেছে, এটা বুঝতে পেরেছে যোশি। জোর দিল সে। কোনি তবুও পাশে। আরো চল্লিশ মিটার পাশাপাশি রইল ওরা।

এরপরই অবরুদ্ধ উত্তেজনা ফেটে পড়ল পুলের চারধারে। কোনি প্রায় এক হাত এগিয়ে এসেছে। আর দশ মিটার বাকি। রমা বুকে বাতাস ভরে জলের উপর যেন লাফিয়ে উঠল হাতের প্রচণ্ড টানে।

চারিদিকে অন্ধকার, কোনি কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা তার শরীরকে কামড়ে ধরেছে। সেটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে বারবার নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার থেকে বেরোবার জন্য দাপাদাপি করছে তার শরীর। একটা শেষ চেষ্টা তাকে মরিয়া করে তুলল।

"কো ও ও নি ই ই!"

দীর্ঘ সুরেলা ধ্বনি জলের উপর দিয়ে ভেসে কোনির শরীরে মৃদু মৃদু আঘাত দিল। শিশু যেমন হাত বাড়িয়ে, দীর্ঘ অদর্শনের পর, মাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইভাবে তার হাত সে বাড়াল এবং বোর্ড স্পর্শ করল। রমা যোশির আগেই।

হিয়া আর বেলার হাত ধরে কোনি জল থেকে উঠেই টলে পড়ছিল, ধীরেন ঘোষ জড়িয়ে ধরল। ছুটে আসছে বাংলার মেয়েরা। রমা যোশি ক্লান্ত হাত কোনির পিঠে চাপড়ে দিয়ে গেল। কোনি চোখ বন্ধ করে হাঁফাচ্ছে। ওকে ঘিরে একটা ভীড় বৃত্ত রচনা করেছে। অভিনন্দন আর আদরে সে ডুবে যাচ্ছে।

এরপর ভিকট্রি স্ট্যান্ডে। একে একে গলায় মেডেল পরা, ব্যান্ড বাজনা। গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে কোনি পুলের ধার দিয়ে ফিরতে ফিরতে থমকে দাঁড়াল। ক্ষিতীশ পিটপিট করে তাকিয়ে। মুখে দশ-বারো দিনের দাড়ি। শরীরটা আরো শীর্ণ হয়ে গেছে।

"কোথায় ছিলে?"

"বল তো কোথায় ছিলুম!"

কোনির ঠোঁট দুটি থরথর করে উঠল। জলে ভরে আসছে দু'চোখ। মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

"মুখ্যুরা তোর টাইমটা রাখেনি, রাখলে দেখতে পেত... কী পেত বল তো?"

কোনি কথাগুলোকে অগ্রাহ্য করে রেগে উঠল। "কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি? খালি বল তো আর বল তো!"

"কোথায় ছিলুম জানিস্, ওইখানে।" কুঁজো হয়ে ক্ষিতীশ ডানহাতের তর্জনীটা তুলে পুলের জলের দিকে দেখাল। "ওই জলের নীচে লুকিয়ে ছিলুম আর বলছিলুম — সব পারে, মানুষ সব পারে... ফাইট কোনি, ফাইট।"

"মিথ্যুক, মিথ্যুক।" কোনি ছুটে এসে ক্ষিতীশের বুকে দুমদুম ঘুসি মারতে শুরু করল। "কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু শুনিনি। যন্ত্রণায় তখন আমি মরে যাচ্ছিলুম।"

"ওইটেই তো আমি রে, যন্ত্রণাটাই তো আমি।"

বলতে বলতে ক্ষিতীশ হা হা শব্দে দরাজ গলায় হেসে উঠল। তখন অনেকেই তাদের দিকে তাকাল এবং দেখল পাগলাটে একটা লোকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপাচ্ছে — যে মেয়েটি এইমাত্র আশ্চর্য সাঁতার দিল, আর তার মাথায় টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে।

নতুন প্রশ্ন-কাঠামো অনুযায়ী প্রশ্নের নমুনা

কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটির মান ৫) :

১. ‘আজ বারুণী।’ — ‘বারুণী’ তিথিতে গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য ‘কোনি’ উপন্যাসে কীভাবে ফুটে উঠেছে?

২. ‘বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ হাত পনেরো দূরের একটা লোক।’ — লোকটি কীভাবে বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল?

৩. ‘ক্ষিদ্দা, তোমার এই লেকচার দেবার বদ অভ্যেসটা ছাড়ো।’—কে, কেন ক্ষিদ্দাকে একথা বলেছিল?

৪. ‘আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট করে চিঠিতে বলা নেই। সেগুলো জানতে চাই।’ — বক্তাকে এর উত্তরে কী জানানো হয়েছিল?

৫. ‘রবীন্দ্র সরোবরে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা।’ — ‘কোনি’ উপন্যাস অবলম্বনে সেই প্রতিযোগিতার বিবরণ দাও।

৬. ‘ক্ষিতীশ এগিয়ে গেল কোনির দাদাকে লক্ষ করে।’ — এই পর্বে কোনির দাদার সঙ্গে ক্ষিতীশের কথোপকথন নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৭. ‘কিন্তু কোনি পাশ করেও ভর্তি হতে পারল না।’ — কোনি কোথায় ভর্তি হতে পারেনি? তাকে ঘিরে চক্রান্তের আবহ রচিত হয়েছিল কেন?

৮. ‘কোনি আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল।’ — কোন্ পরিস্থিতির কথা উদ্ধৃতাংশে ফুটে উঠেছে?

৯. রাগে চিৎকার করে উঠল ক্ষিতীশ, “পারতেই হবে, পারতেই হবে। কোনো কথা শুনব না।” — প্রশিক্ষক ক্ষিতীশের একরোখা জেদ কীভাবে কোনিকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল, তা আলোচনা করো।

১০. ‘আমি ঠিক মডেলে এনে দেব তোমায়।’ — কোনি কাকে একথা বলেছিল? তার সংকল্প কীভাবে সত্যি হয়েছিল?

১১. ‘এরপর ক্ষিতীশ লক্ষ করল কোনি জল থেকে উঠতে দেরি করছে।’ — কোন ঘটনার ফলশ্রুতির কথা উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে?

১২. ‘মানুষের মান বাড়বে।’ — কখন মানুষের মান বাড়বে বলে বক্তা মনে করেন?

১৩. ‘অনেকদিন এমন মজা পাইনি কিন্তু।’ — কোন ঘটনা বক্তার জীবনে মজা নিয়ে এসেছে?

১৪. ‘তুমুল হৈ চৈ পড়ে গেল প্রণবেন্দুর কথায়।’ — কোন্ কথা প্রণবেন্দু বলেছিলেন? তার পরিণতি কী হলো?

১৫. ‘কিন্তু সকালে ক্ষিতীশকে দেখা গেল না।’ — ক্ষিতীশকে কোথায় দেখা গেল না? এর কারণ কী?

১৬. ‘এটা তোমার পাওনা ছিল।’ — বক্তা কোন্ পাওনা কীভাবে মিটিয়ে দিয়েছিল?

১৭. ‘মেয়েদের টিম চ্যামপিয়নশিপ নির্ধারিত হবে এই রিলে সাঁতারেই।’ — সেই সাঁতারে কোনির অতুলনীয় সাফল্যের যে ছবি উপন্যাসে রয়েছে, তার বিবরণ দাও।

১৮. ‘সব পারে, মানুষ সব পারে ...’ — মানুষের সব পারার কথা ‘কোনি’ উপন্যাসে কীভাবে বিধৃত রয়েছে, তা বুঝিয়ে দাও।

১৯. ‘ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত।’ — ক্ষিতীশ সিংহের এই রকম প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?

২০. ‘এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক।’ বুকের মধ্যে কী পুষে রাখার কথা এখানে বলা হয়েছে? ক্ষিদ্দা কেন এই পুষে রাখার কথা ভাবছেন?

২১. দারিদ্র্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনির যে লড়াই তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।